বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

ওঁ

ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৫১তম বর্ষ ◆ দ্বাদশ সংখ্যা ◆ শ্রাবণ, ১৪৩৩ [জুলাই, ২০২৬]

অখিল ভারতীয় সেবা বৈঠক, হরিদ্বার

পরিষদ শিক্ষা বর্গ, উত্তরবঙ্গ

অখিল ভারতীয় ধর্মপ্রসার বিভাগ বৈঠক, হরিদ্বার

পরিষদ শিক্ষা বর্গ, উত্তরবঙ্গ

কল্যাণ বাণী

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে।। ১৮/২৮।।

'অসংযতচিত্ত, অমার্জিত, উদ্ধত, অসৎ, বিদ্বেষপরায়ণ, অলস, হতাশ এবং দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামসিক বলে কথিত হয়।'

সম্পাদকীয়...

বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দ। পরিবর্তনের কালে তাঁদের কথা মাথায় রেখেই আমাদের এই সংখ্যার প্রচ্ছদ ভাবনা রাখা হয়েছে।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে যখন ভারতবর্ষ উরি আতঙ্কবাদী ঘটনার জবাব দেওয়ার জন্য পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "ইয়ে ন্যায়া ভারত হে, ঘরমে ঘুসেগাভী, মারেগাভী।" সেই কথা অনুসারে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পুলওয়ামা হামলার পর ভারত বালাকোটে আকাশ পথে গিয়ে আতঙ্কবাদীদের ঠিকানাগুলোকে এবং অপারেশন সিন্দুরের সময় পাকিস্তানের আতঙ্কবাদীদের সমূলে নাশ করে এই কথনকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছিল। ঠিক একইভাবে ১৫ বছরের সন্ত্রাস সমর্থক সরকারের বিদায় দেওয়ার পর, গত মে মাসে বি.জে.পি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পদ গ্রহণ করার পর, যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা দেখে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তনের সুখ অনুভব করছেন। আবার ২০শে জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের ঘোষণার মাধ্যমে প্রকৃত ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দিয়েছে বর্তমান সরকার। বাস্তবে ২০শে জুন, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বিধানসভায় হিন্দুদের জন্য পৃথক ভূমি বানানোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এই কাজে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রবল ভূমিকা ছিল। তাই গত ২০শে জুন ২০২৬, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তারকেশ্বরে উপস্থিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করেছেন। সেখান থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ৪৫ লাখ কৃষকদের ৯০০ কোটি টাকার সম্মান রাশি প্রদান করেন। এছাড়া বড় সংখ্যার বহু কেন্দ্রীয় যোজনাগুলোকে পশ্চিমবঙ্গে চালু করেন, যা বিগত টি.এম.সি সরকার চালু না করে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের বঞ্চিত করে রেখেছিল। এর পাশাপাশি ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থেকে স্বামীজির পছন্দের যোগকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে পরিচিত করিয়েছেন। যেমন কেন্দ্র সরকারের নেতৃত্বে জগৎ এক নতুন ভারতকে দেখেছে, তেমনি আশা করি বি.জে.পি-র পশ্চিমবঙ্গ সরকার জগতকে নতুন বাংলা ছবি তুলে ধরবে।

সম্প্রতি সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানের ১৯/১-ডি ধারা অনুসারে ফুটপাত দিয়ে নিরাপদে হাঁটাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমাদের দেশে বহু রাস্তার দুধারে নির্দিষ্ট ফুটপাত নেই বা থাকলেও তা ব্যবহারযোগ্য নেই। তাই রাস্তা ধরে যাতায়াতের ফলে, মাঝে মাঝে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আবার শহরে রাস্তার ধারে ফুটপাত থাকলেও তা হকারদের দখলে চলে যাওয়ায় পথচারীদের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে বাধ্য করে। শুধু রাস্তা নয়, রেলওয়ে প্লাটফর্মগুলোতেও হকারদের দখলদারি দেখা যায়। ফলে ট্রেন থেকে নামতে বা উঠতে গিয়ে অনেক সময় বিপদ হতে দেখা গেছে। এইসব অবৈধ দখলদারীগুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের পোষা গুন্ডা বাহিনীর দৌড়াত্ম্যে হয়ে থাকে। আবার কলকাতার মতন মহানগরীর নিউ মার্কেট, চাঁদনীচক, নাখোদা মসজিদ এলাকা, খিদিরপুর, রাজাবাজার ইত্যাদির মতো জায়গায় ফুটপাত উপচে রাস্তা পর্যন্ত হকাররা পসরা নিয়ে বসে পড়েন। তার মধ্যে গাড়ি বা মোটরসাইকেল চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এইসব ব্যবস্থা দীর্ঘ ৫০ বছর ধরেই চলে আসছে, বিশেষ করে গত ১৫ বছরের টি.এম.সি সরকারের বিশেষ ধর্মীয় ব্যক্তিদের তোষণ নীতির ফলে এই সংকট বেড়েই চলেছিল। গত মে মাসে জনগণের রায়ে বি.জে.পি পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন রেলস্টেশন চত্বর, ফুটপাত ইত্যাদির উপর অবৈধ দখলদারি ভেঙে ফেলা হয়েছে, যা খুবই অভিনন্দনযোগ্য এবং সাহসী পদক্ষেপ বলে ভাবা হচ্ছে। এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষাকারী সংগঠনগুলো জীবন জীবিকার প্রশ্নে সংবিধানের ২১ নম্বর ধারার অজুহাতে প্রশ্ন তুলে অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা করছে। তারা হকারদের পুনর্বাসনের দাবি জানাচ্ছে, কিন্তু দেখা গেছে পুনর্বাসনেও সমস্যা মেটে না। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার অবৈধ দখলদারি শুরু করে। সেই জন্য সুপ্রিমকোর্ট একটি নিয়ন্ত্রণ সংস্থা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে, যাদের কাজ হবে ফুটপাত হকার মুক্ত রাখার জন্য নিয়মিত নজরদারি করা উপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। তাই এই রায়ের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং আইন কমিশনারের কাছে পাঠিয়েছে আদালত। ফুটপাত দিয়ে হাঁটা, প্লাটফর্মে হাঁটাচলা যখন নাগরিকদের মৌলিক

অধিকার, তখন বর্তমান সরকারের হকার মুক্ত করার অভিযানকে অবশ্যই সমর্থন জানানো উচিত আমাদের।

ভারতবর্ষে অবৈধ অনুপ্রবেশের সমস্যার কথা সকলেরই জানা আছে। বিভিন্ন অনুমানে বলা হয় প্রায় ১.৫ থেকে ২ কোটি অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গা মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে আছে। এই সমস্যার সমাধানের উপায় হিসেবে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন ১৮ বছরের উর্ধ্বে কোন ব্যক্তির আধার কার্ড সরাসরি বানানো যাবে না। যদি বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে দরকার হয়, তাহলে জেলাশাসকের কাছে আবেদন করতে হবে। যদিও প্রদেশের জনজাতি এবং আদিবাসীদের আধার কার্ড পুরনো নিয়ম অনুসারেই হবে। আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের কাঁটাতারহীন বর্ডার থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারী পরিচালিত সরকার আসার পর বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনেক অনুপ্রবেশকারীকে আমরা ফিরে যেতে দেখেছি। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর প্রয়াসকে সমালোচনা করেছেন মমতা ব্যানার্জি এবং অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাভাষী বলে সুরসুরি দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যাই হোক দেশের মানুষ এখন সব বুঝতে পেরেছে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তোলা সব পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছেন। ভারতবর্ষ যে কোন ধর্মশালা নয়, তাই এখানে অবৈধ অনুপ্রবেশ কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আসাম তথা পশ্চিমবঙ্গের সরকারের এই প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই।

চার দেওয়ালে ঘেরা কোন স্থানকে ঘর বা বাড়ি বানায় কে? পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু কে? এই প্রশ্নের উত্তর হল— তারা হচ্ছেন মহিলা, যাদের হাউস ওয়াইফ বা হোমমেকার বলা হয়। হিন্দিতে গৃহিণী বলা হয়, অর্থাৎ যে মহিলা বাড়িতে থেকে বাড়ির কাজকর্ম করেন। যদিও বর্তমান সময়ে অনেক মহিলারা বাড়ির কাজকর্মের সঙ্গে চাকরি কিংবা ব্যবসাও সামলাচ্ছেন। তাদের হয়তো বা কর্মরত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু বাড়ির যাবতীয় কর্ম যারা করেন তাদের কিন্তু গৃহিনী বলে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করেই রাখা হয়। কিন্তু সম্প্রতি দেশের সুপ্রিম কোর্ট ২০০১ খ্রিস্টাব্দের পাঞ্জাবের দুর্ঘটনার মামলায় রায়দান করতে গিয়ে বলেছেন, গৃহিণী কেবলমাত্র হাউজ মেকার নন। বাস্তবে তাঁদের রাষ্ট্র নির্মাতা (national builder) বলা উচিত। জানা দরকার ভারতবর্ষে আনুমানিক ২১ কোটির অধিক মহিলারা বিনা কোন বেতনে সপ্তাহের সাত দিনই পরিবারের দেখাশুনা করে চলেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এক গৃহিণী রোজ ২৯৭ মিনিট অথবা পাঁচ ঘন্টা গৃহের কাজ করে থাকেন। যেখানে পুরুষরা মাত্র ৩১ মিনিট ওই কাজ করেন। এই সমস্ত অবৈতনিক মহিলাদের দেশের জি.ডি.পি-তে যোগদান ৬-১১ শতাংশ পর্যন্ত থাকে। টাকার অঙ্কে পরিবর্তন করলে এর সংখ্যা ২৩ লাখ কোটি থেকে ৩৮ লাখ কোটি টাকা হবে। এই অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, ওদের কাজের ঘণ্টাকে টাকার গুণিতক করে যা হয়। সুপ্রিম কোর্টের এই উক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং গৃহিণীদের রাষ্ট্র নির্মাতার ভূমিকায় রেখে যোগ্য সম্মান দেওয়া দরকার।

কয়েকদিন আগে স্কটল্যান্ডের এডিন বার্গে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির জনক মহর্ষি সুশ্রুতের এক ভব্য প্রতিমার আবরণ মুক্ত করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠান কেবলমাত্র একটি ঐতিহাসিক স্মারকের উদঘাটন বলে ভাবা উচিত নয়, বরং আধুনিক চিকিৎসার অস্তিত্ত্বে আসার অনেক শত বছর আগে বিকশিত ভারতীয় চিকিৎসা জ্ঞানের বৈশ্বিক স্বীকৃতির প্রতীক হিসাবে ভাবা দরকার। এই প্রতিমাটি এডিন বার্গের রয়েল কলেজ অফ সার্জেনের পরিষরে স্থাপিত করা হয়েছে। মহর্ষি সুশ্রুত খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের বংশধর ছিলেন এবং বেনারসে দীবোদাস ধন্বন্তরি আশ্রমে জ্ঞান প্রাপ্ত করেছিলেন। আয়ুর্বেদের অর্থ হচ্ছে আয়ুর সম্পর্কিত প্রত্যেক জানবার মতন জ্ঞান। ঋষি চরক রচিত চরকসংহিতা কায় চিকিৎসা অর্থাৎ ইন্টার্নাল মেডিসিনের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু সুশ্রুত রচিত সুশ্রুতসংহিতা মুখ্য রূপে শল্য চিকিৎসা আধারিত গ্রন্থ। ২৫০০ বছর আগে তাঁর লেখা গ্রন্থকে মান্যতা দিয়েই ভারতীয় চিকিৎসার জয়গানকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে, তাঁর প্রতিমা স্থাপনার সঙ্গে। যা ভারতীয়দের জন্য গৌরবের বিষয়। ■

<u>আগামী দুই সংখ্যার বিষয়</u>

ভাদ্র ১৪৩৩ (আগস্ট ২০২৬) : স্বাধীনতা দিবস, ঝুলন যাত্রা, মনসা পূজা, শিক্ষক দিবস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস, জন্মাষ্টমী, বিবিধ।

আশ্বিন ১৪৩৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৬) : গণেশ পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, বামন অবতার প্রকট উৎসব, বরাহ অবতার আবির্ভাব দিবস, বিদ্যাসাগর জন্ম দিবস, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী জন্মজয়ন্তী, গান্ধী জয়ন্তী, অশোক সিংহলজি জন্মশতবর্ষ পালন বিবিধ।

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ ওঁ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

কার্যালয় : ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪, দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯

প্রচার কার্যালয় : ১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রিট, খান্না মোড়, কলকাতা-৪

দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭, ড. জয়ন্ত বিশ্বাস : ৭৮৭২০৩৮২২৮

pnb

SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP

9038149815m@pnb

MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫১তম বর্ষ ❋ দ্বাদশ সংখ্যা ❋ শ্রাবণ, ১৪৩৩ (জুলাই, ২০২৬)

‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র পরিচালন মণ্ডলী

● সভাপতি
শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর

● সহ-সভাপতি
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সম্পাদক
অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

● সহ-সম্পাদক
শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল

● প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক

● সহ-প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৩
গঙ্গা দশেরা—আলপনা ঘোষাল ৬
চাকদহের যশরার জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা—সুকন্যা পাল ৮
পবিত্র বঙ্গভূমিতে আচার্য শঙ্কর—ড. অনুপম যশ ১২
হিন্দু জীবনে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা—তমাল ভট্টাচার্য্য ১৫
গুরু : শব্দস্ত উপাদানের অধ্যাত্ম-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান —ডঃ শ্যামলচন্দ্র দাস ১৭
গুরু কৃপাহি কেবলম্—রবিব্রত ঘোষ ২০
প্রযুক্তির যুগে গুরু-পূর্ণিমার প্রাসঙ্গিকতা —অধ্যাপক সমীরণ রায় ২৩
বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ : ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি —অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী ২৫
কবিতা : লহ প্রণাম শ্যামাপ্রসাদ—পিনাকী চ্যাটার্জী ২৬
সনাতনের ঐতিহাসিক বিজয় : ভোজশালাকে মন্দিরের মান্যতা —দিলীপ কুমার ঝাঁওর ২৭
গুরু : জ্ঞানের প্রকাশ স্তম্ভ—ড. জয়ন্ত বিশ্বাস ২৯
কবিতা : যদি উল্টো হতো—সৌমিত্র ঘোষ ৩০
শ্রীরাম সমাজ সংস্কারক ও নারী দরদী —অশোক কুমার চ্যাটার্জী ৩১
পঞ্চবট—রাজকুমারী মাহেশ্বরী ৩৩
बंगाल 2026 : क्या इतिहास पुन: अपनी दिशा बदल रहा है? सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्रचेतना का पुनर्जागरण —प्रशांत सिंघानिया ३८
श्रीमद्भागवत पुराण के श्रोता कैसे हों?—अरुण चूड़ीवाल ४२

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর)	ডাক মাশুল
১৫ টাকা	১৮০ টাকা	২৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান : জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

Back Cover Page	Rs. 50,000/-
Inside Front or Back Cover Page	Rs. 30,000/-
Inside Full Colour Page	Rs. 20,000/-
Colour Half Page	Rs. 10,000/-
Colour Quater Page	Rs. 5,000/-

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com

চিঠিপত্র বিভাগ

পত্রিকার লেখা সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এই নম্বরে হোয়াট্‌অ্যাপ করুন ৭৮৭২৪৬১৬১৬

প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ
মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং
RNI No. : 30136/1976

● লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন e-mail কিংবা WhatsApp-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

গঙ্গা দশেরা

আলপনা ঘোষাল

গঙ্গা দশেরা যা গঙ্গাবতার নামেও পরিচিত। এটি হল গঙ্গার অবতরণ উদযাপনের একটি হিন্দু উৎসব। হিন্দুদের বিশ্বাস এইদিনে পবিত্র গঙ্গানদী স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। গঙ্গা দশেরা হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই পবিত্র দিনের আগের ৯ দিনসহ উৎসবটি ১০ দিন ধরে চলে। বাংলা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেই এই দিন মা গঙ্গাকে তুষ্ট করা হয়। দশমী থেকে 'দশহরা' হওয়ার পেছনে আরও একটি ব্যাখ্যা আছে। যদিও দশহরা নামটি এসেছে 'দশ' থেকে। এই পুজোর প্রতিটি বিধির সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে ১০ সংখ্যাটি। আর 'হরা' শব্দটি পরাজয় থেকে এসেছে। বিশ্বাস করা হয়, এই তিথিতে গঙ্গাস্নান করলে মানুষ দশটি পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। অনেকে আত্মীয়-স্বজনের দেহাবশেষ বহু দূর-দূরান্ত থেকে বয়ে এনে গঙ্গায় বিসর্জন দেয়। তাঁরা মনে করেন এর ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বর্গে গমন করে।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে গঙ্গার জন্ম কাহিনি বিষয়ে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে মতের দ্বৈততা দৃষ্ট হয়। একটি কাহিনি অনুসারে ব্রম্ভার কমণ্ডলু নারীমূর্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ইনি 'গঙ্গা'। বৈষ্ণব মতানুসারে, ব্রহ্মা তাঁর কমন্ডলুর জল নিয়ে সশ্রদ্ধ চিত্তে ভগবান বিষ্ণুর পদ ধৌত করেছিলেন। সেই থেকে গঙ্গার জন্ম। তৃতীয় মতানুযায়ী, গঙ্গা পর্বতরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা এবং পার্বতীর ভগ্নি। তবে প্রতিটি মতেই একথা স্বীকৃত যে, ব্রহ্মা গঙ্গাকে পবিত্র করে তাকে স্বর্গে উত্তীর্ণ করেন।

মহাভারতের কাহিনি অনুসারে রাজা সগর ৬০ হাজার পুত্রের জনক হয়েছিলেন। তিনি একবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাতে ঈর্ষান্বিত হয়ে যজ্ঞের পবিত্র ঘোড়াটি অপহরণ করেন। সগর তাঁর ৬০ হাজার পুত্রকে যজ্ঞের অশ্ব অন্বেষণে প্রেরণ করেন। অশ্ব অন্বেষণ কালে তারা পাতালে ধ্যানমগ্ন মহর্ষি কপিলের কাছে ঘোড়াটিকে দেখতে পান। মহর্ষিকে চোর সন্দেহ করে, তাঁর বহু বছরের ধ্যান ভঙ্গ করলে ক্রুদ্ধ মহর্ষির দৃষ্টিপাত মাত্রই সকলে ভস্ম হয়ে যায়। সগর রাজার ৬০ হাজার সন্তানের আত্মা পারলৌকিক ক্রিয়ার অভাবে প্রেতরূপে আবদ্ধ হয়ে থাকে।

পরে সাগরের বংশধর রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ, তাদের আত্মার মুক্তি কামনায় গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার জন্য ব্রহ্মার তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট ব্রহ্মা, গঙ্গাকে মর্তে প্রবাহিত হয়ে, সগর পুত্রদের আত্মার সদগতিতে সহায়তা করতে নির্দেশ দেন। গঙ্গা এই নির্দেশকে অসম্মানজনক মনে করেন, পরে অবশ্য নারায়ণের আদেশে মর্ত্যলোকে অবতরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তখন ভগীরথ গঙ্গার গতিরোধ করার জন্য শিবের আরাধনা করেন।

ক্রুদ্ধ গঙ্গা শিবের মস্তকে পতিত হন। কিন্তু শিব শান্তভাবে নিজ জটা জালে গঙ্গাকে আবদ্ধ করেন এবং ছোট ছোট ধারায় তাকে মুক্তি দেন। শিবের স্পর্শে গঙ্গা আরো পবিত্র হন। স্বর্গনদী গঙ্গা পাতালে প্রবাহিত হওয়ার আগে মর্ত্যলোকে সাধারণ জীবের মুক্তির হেতু একটি পৃথক ধারা রেখে যান। এইভাবে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল তিন লোকে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা ত্রিপথগামী নামে পরিচিত হন।

যেহেতু ভগীরথ গঙ্গার মর্ত্যে অবতরণের প্রধান কারণ, সেই হেতু গঙ্গার অপর নাম 'ভাগীরথী'। সংস্কৃতে 'ভগীরথ প্রবন্ধ' নামে একটি শব্দবন্ধ প্রচলিত আছে।

গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী। কথিত আছ, মর্ত্যে ভগীরথকে অনুসরণ করার সময় গঙ্গা ঋষি জহ্নুর আশ্রম প্লাবিত করেন। উগ্রতপা জহ্নু ক্রুদ্ধ হয়ে, গঙ্গার সমস্ত জল পান করে ফেলেন। তখন দেবতারা গঙ্গার মুক্তির জন্য ঋষির কাছে প্রার্থনা করতে থাকলে নিজের জঙ্ঘা বা জানু চিরে গঙ্গাকে মুক্তি দেন। এই রূপে গঙ্গা জহ্নু ঋষির কন্যা রূপে পরিচিত হন এবং তার অপর নাম হয় 'জাহ্নবী'।

ভারতীয় শিল্পকলার ধর্মীয় মতানুসারে গঙ্গা এক ইন্দ্রিয় পরায়না, সুন্দরী নারী। তার হাতে একটি উচ্ছ্বলিত জলপাত্র। এই পাত্রটি অফুরন্ত জীবন ও উর্বরা শক্তির প্রতীক, যা মহাবিশ্বের গতিকে পুষ্ট ও সচল রাখে।

গঙ্গা মূর্তির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল, তার বাহন

মকর। এটি একটি কুমির (দেহাংশ) ও মাছের (লেজ) সংকর। পশ্চিমী জ্যোতিষ শাস্ত্রের ‘ক্যাপ্রিকণ’ হিন্দু মকরের একটি রূপ। অন্যদিকে মকর ঋকবেদিক দেবতা বরুণেরও বাহন। এই কারণে গঙ্গার বৈদিক শিকড়ের ধারণাটি দৃঢ় হয়।

গঙ্গা পুজোর সময় যে মন্ত্রটি জপ করা হয় সেটি হল—

সদ্য : পাতকসংহন্ত্রী সদ্য দুঃখনাশিনী সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা, গঙ্গেব পরমাগতি।

গঙ্গা দশেরা প্রধানত উত্তরপ্রদেশে, উত্তরাখণ্ডে, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পালিত হয়, অর্থাৎ যেখানে যেখানে এই নদী প্রবাহিত হয়েছে। হরিদ্বার, বারাণসি, গড়মুক্তেশ্বর, ঋষিকেশ, এলাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতি হল এই উৎসব উদযাপনের প্রধান স্থান। যেখানে ভক্তরা গঙ্গার তীরে সমবেত হন এবং নদীর উদ্দেশ্যে আরতি (একটি ধর্মীয় আচার, যেখানে গঙ্গার সামনে দশ রকম ফলমূল, মিষ্টান্ন সহকারে একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে আরতি করা হয়। মানা হয় (অর্থাৎ) এই বিধিতে ভক্ত শুদ্ধ হন এবং তার শারীরিক অসুস্থতাও নিরাময় হয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

শিবের জটায় গঙ্গার বাস। সেখান থেকেই তাঁর উৎপত্তি, তাই এই দিন শিব পুজোও করা আবশ্যক। শিবলিঙ্গ শান্তির প্রতীক। এই তিথিতে দান, ধ্যান করাও অবশ্যক। সেই সঙ্গে এই তিথিতে নারায়ণেরও পুজো করা হয়। বাংলায় এই তিথিতে মনসা পূজার রীতি রয়েছে বহু জায়গায়। বাঁকুড়ায় জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে দশহরা ব্রত পালন ও মনসা পুজো করা হয়। এই দিন ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা রয়েছে। মনসা পূজার সঙ্গে অরন্ধন রীতিও পালন করা হয়। রাঢ় বঙ্গে বহু মানুষ মা-মনসাকে, মা দুর্গার এক রূপ বলে মনে করে থাকেন। সেই সঙ্গে তার একটি সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। সর্পদেবী মা-মনসাকে তুষ্ট করা হয়, যেন বর্ষায় সাপ খোপের উপদ্রব না বাড়ে। ■

পরিষদ বার্তা

অখিল ভারতীয় সেবা বিভাগের বৈঠক

গত ১৩ ও ১৪ জুন হরিদ্বারের কনখলে পাইলট বাবার আশ্রমে সেবা বিভাগের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেই বৈঠকে কেন্দ্রীয় সেবা প্রমুখ শ্রীঅজয় পারেখ, সহ সেবা প্রমুখ শ্রীস্বপন মুখার্জি, শ্রীআনন্দ হরবোলা, মার্গদর্শক শ্রীনন্দলাল লোহিয়া, শ্রীমধুকর দীক্ষিত উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে কলকাতা ক্ষেত্রের সেবা প্রমুখ শ্রীসুধাংশু পাত্র, ক্ষেত্র সহসেবা প্রমুখ শ্রীহরিশ প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের সেবা প্রমুখ শ্রীকুশল কুন্ডু অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত থেকে মানব সেবা প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক তথা প্রান্তের সহ-সভাপতি শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর, প্রান্ত সহসেবা প্রমুখ শ্রীদিব্যেন্দু চক্রবর্তী, প্রান্তসেবা টিমের প্রমুখ সদস্য শ্রীমহাবীর ব্যানার্জি, শ্রীশুভয় সাহু অংশগ্রহণ করেন। মধ্যবঙ্গ প্রান্ত থেকে সেবা প্রমুখ শ্রীসুজন মুখার্জিও অংশগ্রহণ করেছিলে। এছাড়া ত্রিপুরা, মণিপুর এবং আসামের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের শেষে হরিদ্বারের দুইটি সেবা প্রকল্প (একটি বালিকা এবং অপরটি বালক) পরিদর্শন করানো হয়। উত্তরাখন্ড প্রান্তের এই সেবা প্রকল্পগুলি সত্যি খুবই অভিনন্দনযোগ্য বলে সকলে প্রশংসা করেছেন।

পরিচিতি বর্গের আয়োজন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের যুক্ত করার জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সংগঠনের পরিচিতি বর্গের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া দুর্গাবাহিনী এবং বজরঙ্গ দলের দ্বারা পরিচিত বর্গের আয়োজন করা হচ্ছে। এইসব বর্গের সাধারণ মানুষদের, যুবক-যুবতীদের অংশগ্রহণ খুবই উৎসাহজনক। মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, তাম্রলিপ্ত, কাঁথি, সুন্দরবন, চন্দননগর, মালদহ, শিলিগুড়ি, ব্রহ্মপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলগুলিতে এই পরিচিতি বর্গের আয়োজন করা হয়েছে। এই সমস্ত বর্গে প্রান্ত তথা জেলার কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করে মানুষকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আদর্শ এবং কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখার মতন হয়েছে।

চাকদহের যশরার জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা

সুকন্যা পাল

নদীয়ার চাকদহের যশরার জগন্নাথ দেবের মন্দিরে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার সুদীর্ঘ ইতিহাস আজও লোকমুখে বর্ণিত আছে। বাংলায় জগন্নাথ দেবের আরাধনা ও স্নানযাত্রার প্রসঙ্গ উঠলেই নদীয়ার চাকদহের যশরা গ্রামের জগন্নাথদেবের মন্দির ও ভগবান জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার কথা সবার প্রথমে এসে পড়ে। এই স্থানে এক সুপ্রাচীন জগন্নাথ মন্দির ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট রয়েছে। এই মন্দিরে বলরাম ও সুভদ্রাবিহীন এককভাবে কেবল জগন্নাথ দেব পূজিত হন। জনশ্রুতি অনুযায়ী চাকদহের এই মন্দিরে পুরীর মন্দিরের জগন্নাথ বিগ্রহ প্রায় ৫০০ বছর ধরে বিরাজ করছেন। ৫০০ বছর আগে জগন্নাথ দেবকে বৈষ্ণবভূমি নদীয়াতে ঘাড়ে করে বয়ে এনেছিলেন জগদীশ পণ্ডিত। জগদীশ পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নিমাইকে খুব স্নেহ করতেন জগদীশ পণ্ডিত। নদীয়া জেলার অতি প্রাচীন জনপদের অন্যতম হলেন চাকদহ বা চাকদা। চাকদহ নামকরণের নেপথ্যে নানা রকম ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় আবেগ মিলেমিশে রয়েছে। ধর্মীয় আবেগ ও জনশ্রুতি অনুযায়ী কথিত আছে এই স্থানের পূর্ব নাম ছিল 'চক্রদহ' বা 'চক্রদ্বীপ'। পুরাণে কথিত আছে মর্তে গঙ্গা আনয়নের সময় প্রচণ্ড বর্ষণের কারণে নাকি ভগীরথের রথের চাকা বসে যায় এবং তিনি সেই চাকা টেনে তোলেন ও প্রকাণ্ড দহের সৃষ্টি হয়। এর ফলে রথের চাকায় গভীর খাত সৃষ্টি হয় এবং সেটি গঙ্গা জলে পূর্ণ হলে স্থানটির নাম হয় চক্রদহ। আবার অন্য মতে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন কালে ভগীরথের রথের চাকা এইস্থানে প্রোথিত হয়ে যায় এবং এখানকার নাম হয় চক্রদহ > অপভ্রংশে > চাকদহ। এভাবেই চক্রদহ [চাকদহ] চাকদা নামের উৎপত্তি।

কারো কারো মতে সুদূর অতীতে চাকদহের নাম ছিল 'প্রদ্যুম্নগর'। এটি আরো একটি পৌরাণিক মত যে, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন, সম্বরাসুর রাক্ষসকে বধ করেছিলেন এই চাকদহেই। তাই এই স্থানটি 'প্রদ্যুম্নগর' নামে খ্যাতি লাভ করে। এছাড়াও লোকমুখে প্রচলিত অন্য একটি মত অনুযায়ী সুদূর অতীতে চাকদহ, মনসাপোতা, যশরা নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলের নাম ছিল 'প্রদ্যুম্নগর'। এর ঐতিহাসিক প্রমাণও মেলে অর্ধ সহস্রাব্দ পূর্বে রচিত পণ্ডিত রঘুনন্দনের রচনায়—'প্রদ্যুম্নগরা' যাম্যে সরস্বত্যা স্তথোত্তরে। 'দক্ষিণ প্রয়াগস্ত গঙ্গাতো যমুনা গড়া।' অনেক প্রাচীন জমিদারি কাগজে 'আচম্বিতা' নামটিও পাওয়া যায়। ভৌগোলিক মতে গঙ্গা নদীর বিভিন্ন সময়ে গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এ অঞ্চলে চক্রাকারে একটি বিরাট দহের সৃষ্টি হয়। সেই অনুযায়ী এই অঞ্চলের নাম হয় চক্রদহ বা চাকদহ। কালক্রমে মানুষের মুখে তা পরিবর্তিত হয়ে চাকদহ বা চাকদা নামে পরিচিত লাভ করে। চাকদহ অঞ্চলে নানাবিধ মূর্তি, বিগ্রহ, শিলা, মন্দির প্রভৃতির বাৎসরিক ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা রয়েছে। কোথাও কোথাও বিগ্রহকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা কিংবদন্তি ও অনেক ছোট বড় মেলা। কখনো কখনো আবার দেব মন্দিরটি হয়ে উঠেছে পুরাকীর্তির স্মারক। কিংবদন্তিমূলক বিগ্রহগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম বিগ্রহ হল জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ। চাকদহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ও সংস্কৃতি হল যশরার কাষ্ঠ নির্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির। এই শহরটি অতি প্রাচীন কাল থেকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মচেতনায় ঐতিহ্যমণ্ডিত ছিল।

চাকদহের যশরায় চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৫০০ বছরের সুভদ্রা ও বলরাম বিহীন দারু নির্মিত জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপিত আছে। সুভদ্রা ও বলরামবিহীন এই বিগ্রহের উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট। সুভদ্রা ও বলরামবিহীন এই জাতীয় জগন্নাথ মূর্তি পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই। বেদীতে অবস্থিত জগন্নাথ বিগ্রহের সামনে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি রয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরটি পাঁচ খিলান বিশিষ্ট একটি দালান। দালানের উপর পাঁচটি শিখর বর্তমান। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। মন্দিরের সিংহদ্বার পেরিয়ে সামনে দেখা যায় বিরাট নাট মন্দির। বিশিষ্ট খোলামেলা অনেক জমি নিয়ে সুন্দর এই মঠ। মন্দিরের মূল প্রেক্ষাগৃহে ঢুকলে দেখা যায় সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা, ভগবানের লীলা কাহিনি আরো অনেক তথ্য। তোরণ ভেতরে জগন্নাথ দেবের মূল মন্দিরের

মূল ছাড়াও পাশাপাশি জগন্নাথের স্নানঘাট, সাধুসন্ত কর্মী মঠাধ্যক্ষের থাকার ঘর, রন্ধনশালা, প্রসাদ কক্ষ, গোশালা এবং আরো অনেক কিছু রয়েছে। যেমন রাধাবল্লব ও বাঁশি হাতে গৌর গোপালের বিগ্রহ। পুরীধাম থেকে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহটি বহন করে আনার জন্য যে লাঠিটি জগদীশ পণ্ডিত ব্যবহার করেছিলেন, সেটি এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। পাশে আরেকটি ঘরে মাধব মহারাজ ও অন্যান্য গরুড়ের পটচিত্র। নাট মন্দিরের পিলার সঙ্গে গরুড়ের মূর্তি হাত জোড় করে জগন্নাথকে প্রণাম করছে। দেয়ালে দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, চৈতন্য লীলা নানা দেবতারা রয়েছেন। গাছপালা ছায়া ঘেরা শান্ত আশ্রমিক পরিবেশ এই মন্দিরটি। মূল মন্দিরে প্রবেশ পথের এক পাশে একটি উঁচু স্তম্ভের উপর করজোড়ে বিগ্রহমুখী গরুড় মূর্তি রয়েছে। এই মন্দিরে জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার কোন অনুষ্ঠান হয় না। এটি এখানকার জগন্নাথ দেবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে প্রচলিত অভিমত এই যে, রথ যাত্রার অনুষ্ঠান জগন্নাথদেবেরই অভিপ্রেত নয়। রথ যাত্রার পরিবর্তে বিপুল সমারোহে বার্ষিক জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবই এখানে পালিত হয়। চাকদহের ইতিহাসে জগদীশ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বিগ্রহকে কেন্দ্র করে যে স্নানযাত্রার উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় তা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ও আড়ম্বরপূর্ণ।

প্রতিবছর হিন্দু পঞ্জিকা মতে বাংলা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব পালিত হয়। জগন্নাথ দেবের এই স্নানযাত্রা উৎসব চাকদহের এক সর্ববৃহৎ ও সুপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান। মনুর যজ্ঞের ফলে এই তিথিতে জগন্নাথ দেব আবির্ভূত হন। তাই এই দিনটিকে মনু জনন্নাথ দেবের জন্মদিন পালনের নির্দেশ দেন। জগন্নাথ দেবের এই স্নানযাত্রা উৎসবের আগের দিন রাত্রে মন্দিরে বিগ্রহের পূজা, আরতি, অধিবাস ও ধর্মসভার অনুষ্ঠান পালিত হয়। এতে স্থানীয় ও বহিরাগত মানুষেরাও অংশগ্রহণ করেন। স্নানযাত্রার দিন সকালে ধর্ম আলোচনা, পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ ও স্নানবেদী অবিরাম হরিনাম সংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে। স্নানযাত্রার দিন সকালে মাটির ছোট ছোট ১০৮টি ঘটের গঙ্গাজল তামার একটি বৃহৎ কলসিতে পূর্ণ করে একজন ভক্ত মাথায় নিয়ে বাদ্যযন্ত্র ও হরিনাম সহযোগে গঙ্গা থেকে মন্দিরে বহন করে নিয়ে আসেন। এরপর জগন্নাথ বিগ্রহকে পূজারী পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন ধুতি উপজাত প্রভৃতি পরিধান করান। এইসব কাজ শেষ করার পর জগন্নাথ দেব ভক্তের কাঁধে চড়ে মন্দির গৃহ পরিত্যাগ করে এবং ভগবানকে পার্শ্ববর্তী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্নান বেদীতে নিয়ে আসা হয় এবং এর সাথে সাথে অবিরাম হরিনাম সংকীর্তন চলতে থাকে। উক্ত বিগ্রহ বিধিতে পূজা অর্চনা দেওয়ার পরে গঙ্গা থেকে আনিত ১০৮টি ঘটের জলে জগন্নাথ দেবকে স্নান করানো হয়। জল ছাড়াও স্নানের কাজে দুধ ব্যবহৃত হয়। স্নানযাত্রার শেষে জনন্নাথ দেব গজবেশ ধারণ করেন, যা তাঁর গণেশ রূপ বলে বিশ্বাস করা হয়। স্নানের পরে জগন্নাথ দেবকে সারাদিন বিগ্রহ বেদীতে রাখা হয়। নিবেদিত করা হয় ৫৬ ভোগ। সন্ধ্যের পর পুনরায় জগন্নাথ দেবকে মন্দির গৃহে আনা হয়। স্নানের পর জগন্নাথ দেবের প্রবল জ্বর আসে বলে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে। তাই এরপর ১৪ দিন দেবতাদের জনসাধারণের সামনে আনা হয় না, এই সময়টিকে 'অনসর' বলা হয়। স্নানের পর অনসরের কারণে ১৪ দিনের অদর্শনের এই কাহিনি ও রীতি অত্যন্ত জনপ্রিয়। জগন্নাথ দেবের সুভদ্রা ও বলরামবিহীন মূর্তি হওয়া ও যশরা গ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লোকমুখে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, বহু বছর পরে চৈতন্য মহাপ্রভু জগদীশ পণ্ডিতকে জগন্নাথ পুরীতে গিয়ে পবিত্র নামের মহিমা প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জগদীশ পণ্ডিত সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন। জগদীশ পণ্ডিত সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন। পুরী থেকে ফেরার পথে জগদীশ পণ্ডিত ভগবান জগন্নাথের কাছ থেকে মায়াপুরে তাঁর বাড়িতে তাকে স্থাপন করার নির্দেশ পান। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল 'নবকলেবর'-এর সময় যখন বিগ্রহগুলো প্রতিস্থাপন করার কথা ছিল, তখন পুরীর মন্দির থেকে ভগবান জগন্নাথ দেবের সুন্দর বিগ্রহটি নিয়ে যেতে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর অনুভাষ্য ভাষ্যে লিখেছেন যে, জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথের ভারী বিগ্রহটিকে একটি লাঠিতে বেঁধে ঝুলিতে করে পুরী থেকে বাংলা পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। ভগবান জগন্নাথ দেব কৃপাপূর্বক পালকের মতো হালকা হয়ে গিয়েছিলেন, যাতে জগদীশ পন্ডিতের পক্ষে তাঁকে বহন করা সহজ হয়। কিন্তু যখন জগদীশ পণ্ডিত গঙ্গার তীরে যশরা গ্রামে পৌঁছালেন, তখন তিনি সেই পবিত্র নদীতে স্নান করার ইচ্ছা পোষণ করলেন।

জগন্নাথ দেবকে অবনত করে তিনি স্নান করতে গেলেন। তবে জগদীশ পণ্ডিত যখন গঙ্গা থেকে ফিরে এলেন তখন তিনি দেখলেন যে ভগবান জগন্নাথ দেব অত্যন্ত ভারী হয়ে গেছেন এবং তাঁকে আর বহন করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। চাকদহের যশরায় প্রভুর থাকার ইচ্ছা বুঝতে পেরে শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সেইখানেই ভগবান জগন্নাথ দেবকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন থেকে জগদীশ পণ্ডিতও যশরায় বাস করতে শুরু করলেন। প্রথমে গঙ্গার তীরে একটি লম্বা বটগাছের নীচে দেবতার সেবা করা হত।

আরো একটি জনশ্রুতি আছে যে, সন্ন্যাস নিয়ে পুরীধামে নিমাই থাকবেন। এই কথা শোনা মাত্র জগদীশ পণ্ডিত ভাবলেন যদি জগন্নাথ দেবকে বঙ্গভূমিতে নিয়ে আসা হয়, তাহলে নিমাইকে আর পুরীতে গিয়ে থাকতে হবে না। শ্রীক্ষেত্রে সেইসময় জগন্নাথের নবকলেবর চলছিল, জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথ দেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাতের অন্ধকারে পুরনো বিগ্রহ নিয়ে এক প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে পুটলি বেঁধে বাংলার দিকে রওনা দিয়েছিলেন। চাকদহে গঙ্গাস্নান করার জন্য বিগ্রহসমেত ঝোলাটি মাটিতে রেখেছিলেন এবং স্নানের পর ফিরে এসে বিগ্রহটি আর তুলতে পারেনি। তখন জগন্নাথ দেব তাঁকে স্বপ্নে ওই স্থানেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। জগন্নাথ দেবকে ওইখানেই এক বট গাছের নীচে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। লোকমুখে শোনা যায় বকুল গাছে আম, অশ্বথ গাছে কাঁঠাল এবং কুয়োয় দুধ হয়—এসব দিয়েই জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথ দেবের পুজো করতেন।

আরো একটি মতে, জগদীশ পণ্ডিত একমাস পায়ে হেঁটে পুরী গিয়েছিলেন। পুরীতে জগন্নাথ দেবকে দর্শনের পর মন খারাপ করে তিনি বলেছিলেন, তিনি বৃদ্ধ হবেন চাইলেও আর দেবদর্শনে আসতে পারবেন না। জগন্নাথ দেব তখন জগদীশ পণ্ডিতকে বলেন পুরীর মন্দিরে নবকলেবর হবে। তাঁর নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হবে। পুরনো বিগ্রহটি পুরীর মন্দিরের তুলসী বাগানে সমাধিস্থ করা হবে। পুরনো বিগ্রহটি যেন জগদীশ পণ্ডিত নিয়ে যান। শোনা যায় ভক্ত জগদীশের কষ্ট লাঘবে ভগবান জগন্নাথ দেব আকারে ছোট হয়ে পালকের মতো হালকা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শর্ত ছিল কোথাও রাখলেই বিগ্রহ পুনরায় আকারে ফিরে আসবে। দীর্ঘপথ লাঠি হাতে কাঁধে বিগ্রহ নিয়ে হেঁটে এসে চাকদহের বর্তমান মন্দিরের কাছে ক্লান্ত জগদীশ পণ্ডিত এক সঙ্গীকে বিগ্রহ ধরতে দিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছিলেন। বিগ্রহ প্রকান্ডরূপ ধারণ করে। এরপর শত চেষ্টাতেও জগন্নাথদেবের সেই মূর্তিটি আর তোলা যায়নি। সেখানেই এক বটগাছের নীচে জগন্নাথ দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্থানীয় কিছু ব্যক্তির কাছে শোনা যায় যে, একদা স্বপ্নে জগন্নাথদেব জগদীশ পণ্ডিতকে দেখা দিয়ে পুরীধামে পরিধানে পাণ্ডাদের অত্যাচারে তাঁর দুর্দশার কথা জানান এবং অচিরেই পুরীধাম ত্যাগ করে জগদীশ পণ্ডিতের সাথে গঙ্গা তীরবর্তী জগদীশ মনোনীত যে কোন স্থানে একাই চলে আসার মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। তদানীন্তন পুরীর রাজা প্রতাপচন্দ্র রায়কে জগন্নাথদেব স্বপ্নে দেখা দিয়ে পুরীধাম ত্যাগ করে তাঁর চলে যাওয়ার কথা বলেন ও জগদীশ পণ্ডিতকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন। স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশ অনুযায়ী জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথদেবের বিগ্রহ পুরীধাম থেকে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জগদীশ পণ্ডিতের মনে পড়ে যে স্বপ্নে জগন্নাথ দেব পুরীধাম থেকে তাঁর সঙ্গে চলে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন যে ওই শর্তে প্রভু জগন্নাথদেবকে পথের মধ্যে কোন স্থানে মাটিতে নামানো যাবে না। নামালে তিনি সেই জায়গাতেই থেকে যাবেন। জগদীশ পণ্ডিত নদীয়ার গঙ্গার তীরবর্তী কোন এক মনোরম স্থানে জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সংকল্প নিয়ে একটি পুটলির মধ্যে জগন্নাথ বিগ্রহ নিয়ে লাঠিতে ঝুলিয়ে পুরীধাম থেকে রওনা হন। পুরীধাম থেকে জগন্নাথ বিগ্রহ নিয়ে আসার সময় দীর্ঘ পথ ক্লান্ত জগদীশ পণ্ডিত চাকদহের নিকট গঙ্গা তীরবর্তী যশরা গ্রামে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি করে পূর্বশর্ত ভঙ্গ করে বিশ্রাম করেন। অচিরেই তিনি উপলব্ধি করেন তাঁর পুটলিটি অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছে এবং সেটি মাটি থেকে তোলাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই জগন্নাথ বিগ্রহ এক বৃহৎ বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। বিপন্ন জগদীশ পণ্ডিত নিরুপায় হয়েই যশরা গ্রামে জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পূজার্চনা করতে লাগলেন।

এই সংবাদ ক্রমশ কৃষ্ণনগরাধিপতির কর্ণগোচর হয়। তিনি সেই সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য তার দেওয়ানকে পাঠালেন। দেওয়ান সেই স্থানে এসে জগদীশ পণ্ডিতকে জগন্নাথ বিগ্রহটি সঙ্গে নিয়ে ওই স্থান পরিত্যাগ

করার নির্দেশ দেন। কিন্তু জগদীশ পণ্ডিত তাকে বলেন যে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহটি নিজের ইচ্ছায় এখানে স্থিত হয়েছে। এই বিগ্রহটিকে স্থানান্তরিত করার ক্ষমতা তার নেই। পরে কৃষ্ণনগরাধিপতি সেই স্থানে এসে জগদীশ পণ্ডিতের মুখে সমস্ত কথা শুনে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহের জন্য ঠাকুরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং প্রচুর জমি প্রায় ৫০০ বিঘা বিশাল একখণ্ড জমি বিগ্রহ সেবার জন্য দান করেন। কৃষ্ণরাজ কৃষ্ণচন্দ্র একটি বড় মন্দির নির্মাণ করে ভগবান জগন্নাথ দেবকে সেখানে স্থানান্তরিত করেন। ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ হলে জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথ দেবের বিগ্রহকে ঐ স্থানে স্থাপিত করে নিজ ভ্রাতা মহেশ পণ্ডিতকে পূজার জন্য নবদ্বীপ ধাম থেকে এনে রেখেছিলেন। দুই ভাই মিলে জগন্নাথ দেবের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। অনুসন্ধান থেকে জানা যায় পরে জগদীশ পণ্ডিত ও মহেশ পণ্ডিত দুই ভাই তাদের জীবনের শেষদিকে এক স্থানীয় বিশ্বনাথ গোস্বামীর উপর সেই মন্দিরের দায়িত্ব দিয়ে বৃন্দাবনে চলে যান। পরবর্তীতে মন্দির পরিচালনাকে কেন্দ্র করে সংকট দেখা দিলে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের অনুরোধ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ মন্দির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সবশেষে জানা যায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমন ঘটেছিল এমন ১০৮টি স্থান বেছে নিয়ে সেই সমস্ত স্থানে মন্দির গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন গৌড়ীয় মঠ। যার মধ্যে অন্যতম হল চাকদহের জগন্নাথ মন্দির। শ্রীচেতন্য মহাপ্রভু এবং ভগবান নিত্যানন্দ দুবার যশরার এই মন্দিরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পর জগন্নাথ পুরীতে গমন করতে চাইলেন, তখন শ্রীমতি দুঃখিনী (জগদীশ পণ্ডিতের স্ত্রী) অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু গৌর গোপালের একটি সুন্দর বিগ্রহ উপহার দেন, যা আজও এই মন্দিরের সংরক্ষিত ও পূজিত হয়। মন্দিরে সেবায়েত বলরাম দাস ব্রহ্মচারী বলেন যেউ এই মন্দিরে জগন্নাথদেব ও গৌর গোপালের নিত্য পুজো হয়। এই মন্দিরে প্রতি বছর দুটো করে অনুষ্ঠান হয—জগন্নাথের স্নানযাত্রা এবং পৌষ মাসের শুক্ল তৃতীয় তিথিতে জগদীশ পণ্ডিতের তিরোধান দিবস। জগন্নাথের ইচ্ছা ছিল না তাই এখানে রথ হয় না, তবে মহাসমারোহে স্নানযাত্রার উৎসব পালিত হয়। প্রতি বছর রথ আসলে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের গণ্ডি মুছে স্নানযাত্রা উৎসবে মেতে থাকেন চাকদহের মানুষ। জগন্নাথের স্নানযাত্রা এখানকার প্রধান উৎসব। এখানে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার সময় এক বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়। তবে নিত্য পুজো ছাড়াও বিভিন্ন বৈষ্ণবীয় তিথিতে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। আর প্রতিদিন এখানে জগন্নাথ দেবের অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে বসা মেলার চরিত্র আর পাঁচটি মেলারই মতন। বর্তমানে এই মন্দির ও স্নানযাত্রার মেলার দায়িত্ব গৌড়ীয় মঠের। উক্ত এই বছরে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে (জগন্নাথ মন্দিরে) ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩ (২৯ জুন ২০২৬) সোমবার জগন্নাথের স্নানযাত্রার উৎসব ও দুই দিবস ব্যাপী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ■

দণ্ড মহোৎসব, পানিহাটি, সোদপুর, দক্ষিণবঙ্গ

পবিত্র বঙ্গভূমিতে আচার্য শঙ্কর

ড. অনুপম যশ

গভীর বর্ষার শেষে, যখন গঙ্গার জলধারা আকাশের নীলিমা বহন করে ধীরে ধীরে বঙ্গভূমির বক্ষে নেমে আসে, যখন শিউলির গন্ধে সন্ধ্যার বাতাস এক অনামা বিষাদের সুর তোলে, তখনই এই ভূমি বারবার অনুভব করেছে যুগপুরুষদের পদধ্বনি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন কিছু ক্ষণ আছে, যেগুলো যেন কালপুরুষের ধ্যানমগ্ন উচ্চারণ। শঙ্করাচার্যের বঙ্গে আগমন তেমনই এক মহামুহূর্ত।

দক্ষিণের কালাডি থেকে যে তরুণ সন্ন্যাসী বেরিয়েছিলেন, তাঁর দেহ ছিল ক্ষীণ, কিন্তু অন্তর ছিল হিমালয়ের মতো বিশাল। তিনি পথ চলেছিলেন রাজ্য জয় করতে নয়, মানুষের অন্তর জয় করতে। তাঁর হাতে অস্ত্র ছিল না, ছিল উপনিষদের অগ্নিশিখা; তাঁর রথ ছিল না, ছিল পদযাত্রার ধূলিধূসর ক্লান্তি; তাঁর লক্ষ্য ছিল চিরন্তন সত্যের পুনর্জাগরণ। ভারতবর্ষ তখন নানা দর্শন, নানা বিশ্বাস, নানা আচার-বিচারের সংঘাতে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বেদের ধ্বনি অনেক স্থানে স্তিমিত, সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে বিভাজনের কুহেলিকা। সেই সময় নবীন সন্ন্যাসী আচার্য শঙ্কর এলেন—যেন প্রাচীন ঋষিদের অগ্নিমন্ত্র পুনরায় মানুষের কর্ণে জাগিয়ে তুলতে।

তাঁর দিগ্বিজয়ের পথ তাঁকে নিয়ে এল বঙ্গদেশে—এই নদীমাতৃক, শস্যশ্যামল, কাব্যমগ্ন ভূখণ্ডে। তাম্রলিপ্তের সমুদ্র বন্দরে তখনও দূরদেশের বণিকেরা নোঙর ফেলত; সমতটের জনপদে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলত বৌদ্ধ বিহারের প্রাঙ্গণে; গৌড়ের রাজপথে রাজনীতি ও ধর্মের অদৃশ্য সংঘর্ষ; আর পৌণ্ড্রবর্ধনের বিস্তৃত ভূমিতে ইতিহাস নিঃশব্দে বহন করছিল বহু শতাব্দীর স্মৃতি। সেইসব পথ ধরে হেঁটে চললেন শঙ্করাচার্য—এক হাতে দণ্ড, অন্য হাতে বেদের অমর বাণী।

বঙ্গ তাঁকে কেবল শ্রোতা দেয়নি, দিয়েছিল প্রশ্ন। এই মাটির মানুষ চিরকাল প্রশ্ন করতে জানে—নদীর মতোই তাদের মন বহমান, কখনো স্থির নয়। শঙ্কর সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন অদ্বৈতের কথা; জগতের বহুত্বের অন্তরে যে একের সুর, জীব ও ব্রহ্ম যে পৃথক নয়, মানুষ যে নিজের আত্মার মধ্যেই অনন্তকে ধারণ করে আছে। তাঁর কণ্ঠে উপনিষদের সেই মহাবাক্য যেন নতুন করে প্রাণ পেল—'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি'। নদীর ঢেউ, কৃষকের ক্লান্তি, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি;সব কিছুর মধ্যে তিনি দেখেছিলেন এক অখণ্ড চৈতন্যের দীপ্তি।

কিন্তু বঙ্গভূমিতে তাঁর আগমনের সবচেয়ে অলৌকিক মুহূর্ত ছিল অন্যত্র। এই বাংলাতেই, ইতিহাস ও কিংবদন্তির সন্ধিস্থলে, তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল গৌড়পাদ আচার্যের সঙ্গে; তাঁর গুরুর গুরু, অদ্বৈত দর্শনের সেই নিভৃত মহাতপস্বী, যাঁর ধ্যানের গভীরতা যেন ভারতীয় দর্শনের অতল সমুদ্র। মনে হয়, সেই সাক্ষাৎ কেবল দুই সাধকের নয়—দুই যুগের মিলন। একদিকে প্রাচীন তপস্যার নিস্তব্ধতা, অন্যদিকে নবজাগরণের অগ্নিশ্বাস। গৌড়পাদের নীরব দৃষ্টি যেন শিষ্যের শিষ্যের মধ্যে দেখতে পেল ভবিষ্যৎ ভারতের আত্মাকে।

সেই দিনগুলোর কথা আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অল্পই লেখা আছে; কিন্তু বাংলার বাতাসে, নদীর স্রোতে, প্রাচীন জনপদের ধ্বংসস্তূপে যেন এখনো তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। শঙ্করাচার্যের পদচিহ্ন মুছে গেছে, কিন্তু তাঁর উচ্চারিত বাণী রয়ে গেছে—যেন সন্ধ্যার আকাশে ধ্রুবতারা। তিনি চলে গিয়েছিলেন অল্প কিছুদিন পরেই, মৃত্যুর আহ্বান তাঁর অপেক্ষায় ছিল হিমালয়ের পথে; তবু বঙ্গভূমি তাঁর সেই শেষ যাত্রার এক নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।

এই কাহিনি তাই কেবল একজন সন্ন্যাসীর ভ্রমণগাথা নয়, এটি ভারতবর্ষের আত্মসন্ধানের ইতিহাস; এটি সেই চিরন্তন অনুসন্ধানের কথা, যেখানে মানুষ বাহিরের জগত পেরিয়ে অন্তরের অনন্তের দিকে যাত্রা করে। আর বঙ্গ, তার নদী, তার কুয়াশা, তার মাটি—সেই যাত্রার এক গভীর, বিষণ্ণ, অথচ মহিমান্বিত অধ্যায়।

কেরালার ছোট্ট গ্রাম কালাডি থেকে বেরিয়ে তিনি সারা ভারত ঘুরে মানুষকে জ্ঞান, যুক্তি ও বৈদিক ধর্মের মূল শিক্ষা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই যাত্রা ছিল যেন এক সাধকের 'ভারত আবিষ্কার'; যেখানে প্রতিটি অঞ্চল, ভাষা ও সংস্কৃতিকে তিনি এক সুতোয় বাঁধতে চেয়েছিলেন।

এই জয়যাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়—মাধবাচার্য বিরচিত সটীক সংক্ষেপ-শঙ্কর-জয় গ্রন্থে, প্রাচীন শঙ্কর-বিজয়ম গ্রন্থে, চিদ্বিলাসযতি বিরচিত শঙ্কর-বিজয়-বিলাস গ্রন্থে, অনন্তানন্দ গিরি বিরচিত শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থে, শঙ্করের জন্মভূমিতে প্রাপ্ত শঙ্করের কোন আত্মীয় পণ্ডিত বিরচিত শঙ্কর-চরিত গ্রন্থে এবং সদানন্দ বিরচিত শঙ্কর-জয় গ্রন্থে।

দিগ্বিজয়ে বের হওয়ার আগে তিনি নর্মদা তট পরিক্রমা করে বদরিকাশ্রম, হৃষিকেশ, উত্তরাখণ্ড, কেদারনাথ, গোমুখী, গঙ্গোত্রী, উত্তর কাশী, প্রয়াগ, মহিস্মতি, নাসিক, শ্রী শৈল, গোকর্ন, শৃঙ্গেরি, রামেশ্বর, হয়ে মাতৃ সরকারের জন্য কেরল দেশে ফেরেন।

এরপর তিনি দিগ্বিজয়ে যাত্রা শুরু করেন।

দক্ষিণ ভারতের কেরালা থেকে যাত্রা শুরু করে তিনি প্রথমে যান শ্রী রামেশ্বর তীর্থ ও কাঞ্চীতে। তারপর বিদর্ভ, কর্ণাট ও মধ্য ভারতের নানা অঞ্চল পেরিয়ে পৌঁছান প্রয়াগ ও কাশীতে। সেখান থেকে পশ্চিম ভারতের সৌরাষ্ট্র, অবন্তী, উজ্জয়িনী, সোমনাথ, প্রভাস ও দ্বারকা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন।

পশ্চিম ভারত থেকে তিনি আরও উত্তরে গুর্জর, পুষ্কর, সিন্ধু, গান্ধার, কম্বোজ, কাশ্মীর ও তক্ষশীলায় যান। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় তিনি নানা ধর্মমত, পণ্ডিত ও সাধকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং অদ্বৈত বেদান্তের শিক্ষা প্রচার করেন।

এরপর উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে তিনি পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করেন। জ্বালামুখী, নৈমিশারণ্য, অযোধ্যা, মিথিলা, মগধ, নালন্দা ও গয়া অতিক্রম করে অবশেষে তিনি বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন।

বাংলায় এসে তিনি দেখলেন, এখানে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক প্রভাব খুব বেশি, আর বৈদিক ধর্ম অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তখনই তিনি বাংলার মানুষকে আবার বৈদিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১. বাংলায় আচার্য শঙ্করের আগমন : গয়ায় থাকার সময় আচার্য শঙ্কর শুনলেন, বাংলার অবস্থা খুব ভালো নয়। মানুষ বুদ্ধিমান, কিন্তু বৈদিক ধর্ম প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। চারদিকে বৌদ্ধধর্ম আর নানা তান্ত্রিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। শিব আর শক্তির পূজা হয় ঠিকই, কিন্তু অনেক জায়গায় তা আসল পথ থেকে সরে গেছে। বেদের কথা জানেন এমন মানুষও খুব কম।

এসব শুনে শঙ্করাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্য পদ্মপাদকে বললেন—'তাহলে বাংলায় যাওয়া খুব দরকার।'

পদ্মপাদ তো এমন কাজের জন্য সবসময়ই প্রস্তুত ছিলেন। তাই শঙ্করাচার্য তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বাংলার পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেই সময় বাংলার কয়েকটি বড় অঞ্চল খুব বিখ্যাত ছিল---তাম্রলিপ্ত, সমতট, গৌড় আর পৌণ্ড্রবর্ধন।

তাম্রলিপ্তে : প্রথমে তাঁরা পৌঁছালেন তাম্রলিপ্তে, যা ছিল বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখানে কালীমন্দির ছিল, আবার অনেক বৌদ্ধ বিহারও ছিল। শঙ্করাচার্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈদিক ধর্মের আসল ভাবনা নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি মানুষকে বোঝালেন—ধর্ম মানে শুধু আচার নয়, সত্য ও জ্ঞানের পথ। তাঁর কথা শুনে অনেক মানুষ আবার বৈদিক ধর্মের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

সমতটে : তারপর তিনি গেলেন সমতটে। সেখানে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশি। তবে কিছু পুরনো তীর্থও ছিল; লাঙ্গলবন্ধ, পঞ্চমীঘাট, পরশুরামতলা আর ত্রিবেণী।

শঙ্করাচার্য এখানেও মানুষের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বোঝালেন, বেদ শুধু পুরনো বই নয়—এ মানুষের আত্মজাগরণের পথ। সমতটের রাজা আদিশূর শঙ্করাচার্যের কথা শুনে গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন। পরে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দেশে আবার বৈদিক শিক্ষা ও আচার ফিরিয়ে আনবেন।

ঢবাক অঞ্চলে : এরপর শঙ্করাচার্য উত্তরে ঢবাক অঞ্চলে গেলেন। সেখানেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল অনেক। কিন্তু মানুষ আগে কখনও শঙ্করাচার্যের মতো করে বেদান্তের কথা শোনেনি। তাঁর শান্ত জীবন, যুক্তি আর জ্ঞানের কথা শুনে অনেকেই নতুন করে বৈদিক ধর্মে আগ্রহী হলেন। আবার পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞ শুরু হল।

শঙ্করাচার্য ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে কামরূপের পথে রওনা দিলেন।

২. পৌণ্ড্রবর্ধনে শঙ্করাচার্য : কামরূপ থেকে গৌড়ে যাওয়ার পথে শঙ্করাচার্য পৌঁছালেন পৌণ্ড্রবর্ধনে, আজকের রাজশাহী অঞ্চলে। সেই সময় রাজ্যের অবস্থা খুব খারাপ

ছিল। রাজা প্রচণ্ডদেব শাসন করলেও রাজ্যে অশান্তি, দুর্বলতা আর শিক্ষার অভাব ছিল। ধর্মচর্চার মধ্যেও বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক প্রভাব বেশি ছিল।

শঙ্করাচার্য মানুষকে সহজ ভাষায় বৈদিক ধর্মের মূল শিক্ষা বোঝাতে লাগলেন। রাজা নিজেও তাঁর কথা শুনে গভীরভাবে বদলে গেলেন। পরে তিনি সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস নেন এবং জীবনের শেষ সময় নেপালে কাটান।

৩. গৌড়ে শঙ্করাচার্য : গৌড়ের অবস্থা অন্য জায়গার তুলনায় কিছুটা ভালো ছিল। কয়েক দশক আগে রাজা শশাঙ্ক শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি শৈবধর্মে বিশ্বাস করতেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর রাজ্য অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে আদিশূর রাজা হন। তিনি শঙ্করাচার্যের আদর্শে খুব অনুপ্রাণিত হন। শঙ্করাচার্যের কথা শুনে তাঁর মনে হলো; বাংলায় আবার বৈদিক ধর্ম ও শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি সেই কাজের জন্য উদ্যোগ নিলেন।

৪. মুরারি মিশ্রের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা : গৌড়ে তখন মুরারি মিশ্র নামে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শঙ্করাচার্যের সঙ্গে আলোচনা করতে এলেন।

তিনি বললেন—'আপনার মুখে শুনতে চাই, মীমাংসা আর বেদান্তের মধ্যে আসলে সম্পর্ক কী?'

শঙ্করাচার্য খুব সহজভাবে বোঝালেন। তিনি বললেন, 'মানুষ কর্ম করে সুখ পাওয়ার জন্য। কিন্তু যত সুখ পায়, ততই আরও চাওয়া বাড়ে। এই না-পাওয়ার ইচ্ছাই দুঃখের কারণ।'

তিনি আরও বললেন, 'আসল শান্তি বাইরে নয়, নিজের ভেতরে। মানুষ যদি বুঝতে পারে তার আসল আত্মা পূর্ণ, শান্ত ও আনন্দময়—তাহলেই মুক্তি।' তিনি বোঝালেন, কর্ম দরকার, কিন্তু শেষ সত্যকে জানার জন্য জ্ঞান আরও জরুরি।

মুরারি মিশ্র শঙ্করাচার্যের যুক্তি শুনে মুগ্ধ হলেন। পরে তিনিও মানুষের মধ্যে বৈদিক ধর্ম ও পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রচার করতে শুরু করেন।

বাংলায় আবার ধীরে ধীরে বৈদিক ধর্মের নতুন জাগরণ শুরু হলো।

৫. গৌড়পাদাচার্যের সঙ্গে অলৌকিক সাক্ষাৎ : একদিন গঙ্গার তীরে শঙ্করাচার্য ও তাঁর শিষ্যরা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সন্ধ্যার সময় চারদিকে শান্ত পরিবেশ; আকাশে ম্লান আলো, গঙ্গার জলের শব্দ, ঠান্ডা বাতাস। হঠাৎ শঙ্করাচার্য দেখলেন দূরে এক উজ্জ্বল আলোর মতো কিছু এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে তিনি দেখলেন—একজন যোগী। হাতে কমণ্ডলু, গায়ে গেরুয়া বসন, মুখে অদ্ভুত শান্তি আর জ্যোতি।

ধ্যান করে শঙ্করাচার্য বুঝলেন—ইনি তাঁর গুরু গোবিন্দপাদের গুরু, মহান যোগী গৌড়পাদাচার্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে প্রণাম করলেন।

গৌড়পাদাচার্য স্নেহভরে বললেন,—'শঙ্কর, তোমার কাজ দেখে আমি খুব খুশি।'

তিনি জানতে চাইলেন, শঙ্কর তাঁর লেখা মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য দেখেছেন কি না।

শঙ্করাচার্য বিনয়ের সঙ্গে পুরো ভাষ্য মুখস্থ আবৃত্তি করে শোনালেন। সব শিষ্য অবাক হয়ে গেলেন তাঁর স্মৃতিশক্তি ও জ্ঞানে।

খুশি হয়ে গৌড়পাদাচার্য বললেন,—'একটা বর চাও।'

শঙ্করাচার্য বললেন,—'আমার মন যেন সবসময় চিরসত্য ব্রহ্মে স্থির থাকে।'

গৌড়পাদাচার্য বুঝলেন, শঙ্করের পৃথিবীর কাজ প্রায় শেষের দিকে। তিনি আশীর্বাদ করে ধীরে ধীরে আলোর মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

শিষ্যরা সেই দৃশ্য দেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁদের মনে হলো—তাঁরা যেন মানবজীবনের সীমা ছাড়িয়ে অন্য এক জগতের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। গঙ্গার জলে তখন সন্ধ্যার শেষ আলো কাঁপছিল; বাতাসে ধূপের গন্ধের মতো এক অদৃশ্য পবিত্রতা ভেসে বেড়াচ্ছিল। কেউ কোনো কথা বলল না। শুধু শঙ্করাচার্য দীর্ঘক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেই শূন্যতার দিকে, যেখানে কিছুক্ষণ আগেও তাঁর পরমগুরু গৌড়পাদাচার্যের জ্যোতির্ময় উপস্থিতি ছিল। সেই মুহূর্তে যেন তিনি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন—মানুষের জীবন ক্ষণিক, কিন্তু সত্য চিরন্তন। দেহ আসে, দেহ বিলীন হয়; রাজ্য ওঠে, রাজ্য ভেঙে যায়; মতবাদ জন্ম নেয়, আবার সময়ের স্রোতে হারিয়েও যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মসত্যের সেই অনন্ত দীপশিখা যুগে যুগে এক সাধক থেকে অন্য সাধকের অন্তরে জ্বলে থাকে।

বাংলার আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে শঙ্করাচার্যের মনে হলো, তাঁর পথযাত্রা আর খুব দীর্ঘ নয়। ভারতের মাটি তিনি ঘুরে দেখেছেন; হিমালয়ের তুষারশিখর থেকে

সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাস পর্যন্ত, গঙ্গার তীর থেকে মরুভূমির ধূলি পর্যন্ত। কত রাজা, কত পণ্ডিত, কত তপস্বীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে; কত বিতর্ক, কত জ্ঞানসংলাপ, কত নিঃসঙ্গ রাত্রি তিনি অতিক্রম করেছেন। কিন্তু এই বঙ্গভূমিতে, গঙ্গার নিস্তব্ধ তীরে, গৌড়পাদের সেই অলৌকিক আবির্ভাব যেন তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনাকে এক অদৃশ্য পূর্ণতা দিল। পরদিন ভোরে, যখন পূর্ব আকাশে সূর্যের প্রথম আলো ফুটল, শঙ্করাচার্য আবার পথ চলা শুরু করলেন। তাঁর শিষ্যরা নীরবে তাঁর পেছনে চলতে লাগল। কারও মুখে কোনো প্রশ্ন ছিল না। কারণ তারা বুঝেছিল; যে মানুষ সত্যকে স্পর্শ করে, তার পথ আর সাধারণ মানুষের পথের মতো থাকে না।

বাংলার মাটিতে শঙ্করাচার্যের সেই পদচিহ্ন আজ আর দৃশ্যমান নয়। তাম্রলিপ্তের বন্দর নিঃশব্দ, সমতটের বহু বিহার ধ্বংসস্তূপে পরিণত, গৌড়ের রাজপ্রাসাদ সময়ের ধূলায় মিশে গেছে। তবু ইতিহাসের গভীরে এখনো যেন শোনা যায় এক তরুণ সন্ন্যাসীর পদধ্বনি; যিনি মানুষকে শিখিয়েছিলেন, ধর্ম কেবল আচার নয়, আত্মাকে জানার পথ; জ্ঞান কেবল তর্ক নয়, মুক্তির আলো। আর সেই কারণেই শঙ্করাচার্যের বঙ্গযাত্রা কেবল অতীতের একটি ঘটনা নয়। এটি ভারতবর্ষের আত্মার ইতিহাস—এক সাধকের নিরন্তর অনুসন্ধান, যিনি বিভেদের অন্ধকারের মধ্যে একতার দীপ জ্বালাতে চেয়েছিলেন। গঙ্গার মতোই তাঁর বাণী আজও প্রবাহমান—নীরব, গভীর, অনন্ত। ■

হিন্দু জীবনে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা

তমাল ভট্টাচার্য্য

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যস্ততার যুগ। মানুষের জীবন যত আধুনিক হচ্ছে, ততই যেন মানসিক অশান্তি, একাকিত্ব এবং মূল্যবোধের সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু জীবনে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে। মন্দির কেবল একটি উপাসনালয় নয়; এটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সামাজিক সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং মানবিক মূল্যবোধের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখা, মতবাদ ও উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম হল মন্দির। মন্দিরে নিয়মিত যাতায়াত, প্রার্থনা, পূজা, কীর্তন এবং ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। এতে ধর্মীয় পরিচয়ের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ববোধও বৃদ্ধি পায়।

বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন, ইসকন, ভারত সেবাশ্রম সংঘসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মন্দিরকেন্দ্রিক ধর্মীয় আলোচনা, গীতা পাঠ, ভাগবত আলোচনা, নামসংকীর্তন ও আধ্যাত্মিক সভার আয়োজন করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানের বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে।

প্রথমত, নিয়মিত ধর্মীয় আলোচনা মানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটায়। লোভ, হিংসা, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নেতিবাচক প্রবৃত্তি কমিয়ে ঈশ্বরপ্রেম, সহমর্মিতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান যান্ত্রিক জীবনের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ থেকে মুক্তি পেতে মন্দির অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। মন্দিরের শান্ত পরিবেশ, ধূপের সুগন্ধ, ঘণ্টাধ্বনি, ভজন ও নামসংকীর্তন মানুষের মনকে প্রশান্ত করে এবং আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে।

তৃতীয়ত, মন্দির সৎসঙ্গ ও সামাজিকীকরণের অন্যতম কেন্দ্র। এখানে বিভিন্ন বয়স, পেশা ও আর্থিক অবস্থার মানুষ একত্রিত হন। ফলে পারস্পরিক পরিচয়, সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। সমাজে একতা ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে ওঠে।

চতুর্থত, মন্দির আমাদের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত শিক্ষার কেন্দ্র। উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতো ধর্মগ্রন্থের আলোচনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম নিজেদের শিকড়, ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। এর ফলে সনাতন ধর্মের মূল্যবোধ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়।

পঞ্চমত, বহু মন্দির আজ সমাজসেবামুলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। অন্নদান, চিকিৎসা শিবির, শিক্ষাসেবা, দুর্যোগে

ত্রাণ প্রদান এবং দরিদ্র মানুষের সহায়তার মতো নানা মানবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অনেকেই যুক্তি দেন যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, তাই মন্দিরে না গিয়েও ঈশ্বরচর্চা সম্ভব। নিঃসন্দেহে হিন্দু দর্শন অনুযায়ী ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং গৃহে বসেও ভক্তিভরে উপাসনা করা যায়। তবে মন্দিরের গুরুত্ব এখানেই যে, এটি ব্যক্তিগত সাধনাকে সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। একজন মানুষ একা প্রার্থনা করতে পারেন, কিন্তু সমষ্টিগত ধর্মচর্চা সমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা সৃষ্টি করে।

আমরা যদি অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজে নিয়মিত মসজিদে যাওয়া তাদের মধ্যে একতা, পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে একই কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ আরও গভীর হয়। একইভাবে হিন্দু সমাজেও নিয়মিত মন্দিরমুখী হওয়ার সংস্কৃতি গড়ে উঠলে সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে।

দুঃখজনকভাবে বর্তমান সময়ে বহু হিন্দু কেবল বিশেষ উৎসব বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের সময় মন্দিরে যান। কিন্তু যদি সপ্তাহে অন্তত একদিন বা নিয়মিতভাবে মন্দিরে যাওয়া, ধর্মীয় আলোচনা শোনা এবং সৎসঙ্গে অংশগ্রহণ করার অভ্যাস গড়ে ওঠে, তবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—তিন ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।

হিন্দু জাগরণের জন্য মন্দিরকে কেবল পূজার স্থান হিসেবে নয়, বরং শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সেবা এবং সামাজিক ঐক্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নিয়মিত মন্দিরে যাওয়া মানে শুধু দেবদর্শন নয়; এটি নিজের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, আত্মশুদ্ধি এবং সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার একটি মহৎ উপায়।

সুতরাং বলা যায়, মন্দির হিন্দু জীবনের হৃদয়কেন্দ্র। ব্যক্তি ও সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, নৈতিক শিক্ষা এবং হিন্দু সমাজের ঐক্য ও জাগরণের জন্য মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা আজও অপরিসীম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন যেখানে বহু লোক একত্রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও পূজা করে, সেখানে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়—ঈশ্বর বিরাজমান হন তথায়। তাই প্রত্যেক সনাতন ধর্মাবলম্বীর উচিত সুযোগমতো নিয়মিত মন্দিরে যাওয়া, ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা এবং আগামী প্রজন্মকেও এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করা। ■

বিশ্ব হিন্দু বার্তার পাঠক সম্মেলন, দুর্গাপুর, মধ্যবঙ্গ

দুর্গাবাহিনীর পরিচিতি বর্গ, কেশপুর, মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

দুর্গাবাহিনীর পরিচিতি বর্গ, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণবঙ্গ

গুরু : শব্দস্ত উপাদানের অধ্যাত্ম-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

ডঃ শ্যামলচন্দ্র দাস

'গুরুতত্ত্ব ভজন-সাধন কল্কে গড়গড়া/অভক্তি-জল ফেলে দিয়ে ভক্তি-জল পু'রা' (প্রচলিত লোকগান) অথবা 'ভক্ত বড় শক্ত বটে, গুরু থাকলো বসে/গাছের ফল গাছে থাকলো, বোঁটা পড়লো খসে' (শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বোঁটায় ভক্তি নামক গাছের ফল ফলে থাকে, কিন্তু তা না থাকলে লোক-দেখানো ভক্তির কোন অর্থ হয় না)। পূর্বপুরুষের মুখ থেকে এই লোকগান বা হেঁয়ালির অংশটি প্রায়শই ছোটবেলায় শুনেছি। এমন অসংখ্য বাঙালি সংস্কৃতি, এমনকি প্রবাদ-প্রবচন-লোকগানে রয়েছে গুরু শব্দের প্রয়োগ। বাঙালির বিভিন্ন লোকগানে, প্রাচীনপন্থী শিখন ও শিক্ষায়, আধ্যাত্মিক তান্ত্রিক যোগ সাধনায়, একাধিক ধর্মীয় সাধনার ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগের সাহিত্যে, এমনকি শিখ সম্প্রদায়ের জীবনচর্যায়, ইত্যাদি প্রভৃতি একাধিক ক্ষেত্রে রয়েছে গুরুর গুরুত্ব। যেমন লোকগানে রয়েছে 'কী চমৎকার ফল গো গুরু ধরেছে ওই গাছে।' (সুফী বাউল), 'গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে মন প্রাণ দিয়া রে' (বাউল গান), 'গুরু দোহাই তোমার, মনকে আমার লও গো সুপথে' (লালন গীতি) ইত্যাদি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য। চর্যাপদেও এই গুরুর উল্লেখ বিদ্যমান—'লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ'। লোকশ্রুতি অনুসারে বলা যায়, মধ্যযুগে শিশু চৈতন্য দুগ্ধ পান করার আগে মা শচীমাতাকে বলেছিলেন 'গুরুকরণ হয়নি মায়ের অপবিত্র আছে/ গুরুমন্ত্র লও গো মাতা, লও গো কানের কাছে'। সংস্কৃত শাস্ত্র অনুসারে সনাতনী দেবতারা হলেন আধ্যাত্মিক গুরু। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বরও। পিতা-মাতাও গুরুজন। তাছাড়া গুরু পত্নী বা গুর্বী, গুরু তনয়া/দুহিতা/ কন্যা ইত্যাদি শ্রদ্ধার যোগ্য। শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, ধর্মগুরু, যোগগুরু, তন্ত্রগুরু, সংগীত গুরু, অস্ত্রগুরু, দেবগুরু (গুরু বৃহস্পতি), দৈত্যগুরু (শুক্রাচার্য) ইত্যাদি সনাতনী সংস্কৃতিতে বিদ্যমান। এমনকি 'গুরুমারা বিদ্যা' প্রবচনে স্বীকৃত হয়ে থাকে। চুরিবিদ্যাও শিখতে গেলে গুরু লাগে 'চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড়ো ধরা'। তবে গুরু যদি মনে করে 'আমিই গুরু', তবে তা হয়ে ওঠে হাস্যকর। লোককথায় রয়েছে, একদা এক গুরু ও শিষ্য বনে গিয়েছিল কিছু ফল জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে। সে সময় রাস্তায় একটি মাঝারি চওড়া জলের নালা দেখে থমকে দাঁড়ায়। শিষ্য সেই নালাটি অতিক্রম করার আগে 'জয় গুরু' নাম স্মরণ করে ঝাঁপ দেয় এবং নালা অতিক্রম করে ওপারে চলে যায়। তখন গুরু ভাবে, আমার নাম নিয়ে সে নালাটি পেরিয়ে গেল! তখন সে নালা পার হওয়ার সময় ঝাঁপ দেয় 'জয় আমি' বলে। ফলে সেই নালার জলে ভূপতিত হয়ে যায় এবং জলে নাকানিচোবানি খেতে থাকে। ফলত বোঝা যায় গুরুরও গুরু রয়েছে, রয়েছে দেবগুরু ইত্যাদিও। ছন্দ মিলিয়ে সংক্ষিপ্ত গুরুর গল্প অনেক সময় লোককথায় প্রচলিত রয়েছে—' এক যে ছিল গুরু আমার গল্প হল শুরু,/গুরু গেলেন মারা, আমার গল্প হল সারা'। একালে আধুনিক প্রজন্মের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবকে 'গুরু' হিসেবে সম্বোধন করে মজা মশকরা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে থাকে—' কী (হেব্বি) দিলি, গুরু!' এক্ষেত্রে বন্ধুর জন্য প্রশংসা বা ব্যজস্তুতি নিহিত থাকা সম্ভব।

সৎসঙ্গী তথা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের অনুসারীরা একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে বা কথোপকথনের শুরুতে ও শেষে, সারস্বত মঠের স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্য ও অনুসারীরা আধ্যাত্মিক চেতনা জাগরণের অংশ হিসেবে, হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারী মতুয়া সম্প্রদায়ের শিষ্য-শিষ্যরা কথাবার্তায় এই 'জয়গুরু' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। শিখ সংস্কৃতিতেও গুরুজীর জয় ঘোষিত হয়ে থাকে 'ওয়াহে গুরুজী কী ফতেহ!'

এই গুরু অবশ্য আধ্যাত্মিক সাধক ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ঘটকের কাজ করেন। অনুঘটকের মত নিজের স্থির থেকে ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক গূঢ় করতে সাহায্য করেন। একদা প্রাচীন যুগে দেবগুরু বৃহস্পতি, দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য, গুরু বিশ্বামিত্র প্রমুখ সহ বৈদিক যুগের গুরুকুলের একাধিক গুরু ছাড়াও যারা বাঙালি সমাজে আধুনিক কালে গুরু হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীশ্রীঅনুকুল ঠাকুর, বালক ব্রহ্মচারী, প্রভু জগদ্বন্ধু, মতুয়া

সমাজের হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ প্রমুখ উল্লেখ্য। শুধু গুরুকুল শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেকেই ভূমিকা নিয়েছিলেন একসময়, যেমন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ওরফে মহাত্মা মুন্সি রাম, শাস্ত্রীজী মহারাজ শ্রীধরমজীবন দাস স্বামী, শ্রীশ্রীআনন্দ-মূর্তিজী প্রমুখ।

এদের মধ্যে কেউ হলেন দীক্ষাগুরু, কেউবা সদগুরু, কেউবা শিক্ষাগুরু। যারা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক গুরু তারা ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক, কিন্তু যারা যোগ-তন্ত্র বা কোন বিশেষ সাধনাতে সিদ্ধি লাভ করে ধর্মীয় জ্ঞান বা সত্য সন্ধানী শিষ্যদের আগ্রহী করে তোলেন তিনি হলেন সৎপথের সদগুরু, গুরুবাবা।

তবে একালে কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সূচক-বাচক বা বৌধক গুরু যেমন রয়েছেন তেমনি মেন্টর, গাইড, এক্সপার্ট, মাস্টার, টিচার, শিক্ষকও গুরু হিসেবে গণ্য। কারণ তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারঙ্গমতা দিয়ে শিষ্যের মধ্যে সুপ্ত গুপ্ত থাকা অবস্থাকে জাগ্রত করে তোলেন। কাজেই সঞ্চারকের দক্ষতা বা কৃতিত্ব-মাহাত্ম্য অবশ্যই গুরুদেবের প্রাপ্য।

আবার গুরু শব্দের অর্থ হল ভারী, ওজনদার, ভরওয়ালা, গম্ভীর। ল্যাতিন শব্দ গ্রাভিস-এর অর্থ এমনই। সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব ধরলে 'গুরুরেকো গ-কারস্তু', অর্থাৎ একক বর্ণ গুরু বা দীর্ঘ হলে গ-কার বা গ-গণ হয়। যাইহোক, গুরুভার, লঘু-গুরু ইত্যাদি শব্দ যখন বলা হয়, তখন এই বিশেষণ বাচক অর্থ আভাসিত হয়ে যায়। সে দিক থেকে গুরু হলেন মহিমান্বিত, সম্মানিত, রাশভারী, জ্ঞানী, আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞায় ভারাক্রান্ত, শাস্ত্রীয় জ্ঞান-গরিমায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ। বলা বাহুল্য যে, গুরুভার যিনি বহন করে উড়তে পারেন তিনি হলেন গরুড়।

এই ধরনের 'গুরু' কেন্দ্রিক শব্দ বাংলা ভাষায় যথেষ্ট রয়েছে। যেমন গুরু-ত্ব, গুরুতর, গুরুতম, গুরুভার, গুরুগম্ভীর, গুরুজন, গুরুঠাকুর, গুরুদেব, গুরুকরণ, গুরুদক্ষিণা গুরুবল, গুরুবার (বৃহস্পতিবার), গুরু-পরম্পরা/গুরুক্রম, গুরুকুল/গুরুগৃহ, গুরু(খর)জল, গুরু নিতম্বা, গুরু পাক, গুরু ভোজন, গুরু ঘাতক ইত্যাদি। তবে গুরুচণ্ডালী, লঘু-গুরু জ্ঞান যেমন রয়েছে, গুরু গুরু মেঘের গর্জন ('গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে, গরজে গগনে', রবীন্দ্রনাথ), তেমনি আছে অগুরু চন্দন (বিশেষ ধরনের চন্দন) ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ।

যাইহোক, এই গুরু অজ্ঞ শিক্ষার্থীর কাছে আলোকবর্তিকা বা ইঞ্জিন কিংবা ঘটক (বা অনুঘটক বললেও দ্বিরুক্তি হয় না)। প্রকৃত শিষ্যের পিলসুজে গুরু জ্ঞানের আলো জ্বালানোর অবকাশ পান। সেজন্য শাস্ত্রে বলা হয়—

''অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।''

এইভাবে দেখলে ঘটকের মতো গুরু জ্ঞানের আলোর সঙ্গে প্রায় জ্ঞানহীন শিক্ষার্থীর সংযোগ ঘটিয়ে দেন। তবে পুরোটা ধ্বন্যাত্মক অনুঘটকের মতো নাও হতে পারেন গুরু। কারণ শিষ্যের প্রেরণা ও প্রভাবে অনেক সময় গুরুর মনের আংশিক পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। যদিও গুরু এক একটি বড় গাড়ির ইঞ্জিন বা ড্রাইভারও হতে পারেন। কারণ গুরু যেভাবে চালনা করেন অনুরক্ত শিষ্যকে সেভাবে চালিত হলে উদ্দিষ্ট বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে সহজেই। সেক্ষেত্রে গুরুর কৃপা বা মাহাত্ম্য অনস্বীকার্য।

√গৃ ধাতুর আক্ষরিক অর্থ হল বলা বা উপদেশ দেওয়া। আবার গৃ মানে আহবান বা প্রশংসা করা। গু=গতি বাড়ানো বা তাগিদ দেওয়া, অনুপ্রাণিত করা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। গুর্ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞানে বা প্রজ্ঞায় ভারী। সংস্কৃত বা হিন্দি শব্দ গুর মানে হল কাজের কৌশল বা পদ্ধতিও। আবার গুড়-এর নানা মানে থাকলেও একটি অর্থ হল উপরে তোলা, প্রয়াস করা। এগুলো গুরুর অর্থের সাথে অনেকটাই নানামুখিতায় মিলে যায়। কেননা গুরু জ্ঞানের দিক থেকে প্রাণিত করে, উপরে তোলার প্রয়াস করে।

তবে আন্তর্জালিক তথ্য অনুসারে গু হল অজ্ঞতার অন্ধকার। তবে এই গু হল যে গামী নব রূপে উত্তীর্ণ। গু-তে যে গামী থাকে তা মিলেমিশে নতুন রূপে নতুন ক্ষেত্রে প্রকট হতে পারে। অবশ্যই মানসিক স্তরে, মানসলোকে। বক্তা যখন শ্রোতাকে গুজ গুজ বা গুজুর গুজুর করে কিছু বলে থাকেন তখন সেই কথন জনন করে গু। এ হল বক্তব্য বা বাচন-গু। এর জন্য অর্জিত জ্ঞান নতুন ভাবে ও রূপে উত্তীর্ণ হয়। এই গু যিনি দান করেন অথবা এটি যার কাছে প্রাপ্য তিনিই আসলে গুরু। গুরু যা দেন ইংরেজিতে তাকে বলা যেতে পারে গুডস্ বা পণ্য, যা মলবাচক নয়, বরং মালসূচক। ফারসি ভাষায় এটি হতে পারে গুল্ অর্থাৎ পুষ্প তথা গোলাপ ফুল। যা

আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে পাওয়া যায় তা আসলে অনুভবেদ্য, অব্যক্ত শব্দ গু। গুর গুর ইত্যাদি ধ্বন্যাত্মক শব্দ তেমনই। গু-এর রহস্যময়তা তথা বোধ বা জ্ঞান যাতে থাকে, তা হল গুণ। এটি আমন্ত্রণ করে, যা দিয়ে সংযোগ সাধিত হয়। ধর্ম, ভাব, বিশিষ্টতা, উৎকর্ষ বিশেষ, শ্রেষ্ঠতা, দড়ি, সুতা ইত্যাদি বুঝাতেও গুণ শব্দের প্রচলন রয়েছে। গু-র রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাতে, কিংবা যিনি গর্ভাধানাদি সংস্কার করেন ও অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করেন, যিনি মহান, বিশাল, বৃহৎ, দুর্ভার, পূজ্য, মান্য, প্রিয়, উত্তম, শ্রেষ্ঠ, প্রধান তিনি আসলে গুরু।

শুধু তাই নয়, মানুষের সর্জন নতুন রূপে উত্তীর্ণ যাতে তা হল জ্ঞানসম্পদ, সেই জ্ঞান যার কাছে বা যেখানে থাকে বা রক্ষিত হয়, তিনি গুর, এই গুর যদি তাঁর মাধ্যমে পুনরায় নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে তখন সেই জ্ঞানধারা পরিণত হয় গুরু-তে। এই গুরুরা রাজা সম্রাটদের চালাতেন। প্রায় বারো হাজার বছরের ইতিহাসে এরাই ছিলেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। সেজন্য নানা ঐতিহ্যে গুরু বন্দনা অতীত থেকে আজও বিদ্যমান রয়েছে।

রু হল ঠেলে সরানো, বিদূরণ, বিনাশ। অন্ধকার, অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, জ্ঞানাভাব দূর করে জ্ঞানের আলো আনয়ন। নানামুখী জ্ঞানের আলোর ঘাটতি থাকলে মুক্তি অসম্ভব প্রায়। অতএব আক্ষরিক জ্ঞান, মূল্যবোধ তথা যম ও নিয়ম (নৈতিক সংযম ও ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা পদ্ধতি), অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যিনি ভাগ করে নেন তিনি আসলে গুরু।

এবার এক একটি একক বর্ণে আসা যাক। গ হল জ্ঞান, গতি, সৃষ্টির উৎস। গড়পড়তা মানুষ যে পথে চলতে চায়, সে পথে নয়, একটু সুপথে, মানসিক সঞ্জননের পথে, আধ্যাত্মিক মার্গে এগোনোর গতি, যেখানে জীবনের অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির প্রয়াস সতত সচল থাকে। এক্ষেত্রে চেতনা ও আত্মিক শক্তির বৃদ্ধি যেমন ক্রিয়াশীল থাকে তেমনি থাকে অন্য এক বোধোদয়ের প্রয়াস। ইংরেজি বর্ণ জি-তে আত্মদর্শন, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞানবত্তা, প্রজ্ঞা, গভীর চিন্তা, জ্ঞানান্বেষণ, গবেষণা ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় এতে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, আত্মমগ্ন দার্শনিক ও গভীর মননশীল ধারণার অনুশীলন বা জ্ঞান পিপাসা, মেধা, উদ্যাম ইত্যাদিও আভাসিত হয়ে থাকে। তবে সিদ্ধিদাতা গণেশের সূচক বর্ণ গ—'ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ'। সিদ্ধিদাতা গণেশ হলেন ধ্বনির মৌলিক শক্তি, যা সর্ব বাধা দূর করে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি আনয়ন করে।

তবে ধ্বনিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গ-য়ে থাকে 'গাম্ভীর্য্য' (ধ্বনি-বিচার)। যখন বলা হয় 'পালের গোদা কিন্তু গৌরবেই গুরু', তখন গম্ভীর ভাব আভাসিত হয়ে যায়। যদিও র-তে রয়েছে 'কঠোরতা ও কর্কশতা'। গুরু অনেক সময় কোমলে কঠোরে গড়া মানুষ হয়ে থাকেন, যেটা 'অপুর পাঠশালা'য় গুরুর চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় দেখলে আমরা অনেকেই টের পেতে পারি।

উ হল অউম ধ্বনির দ্বিতীয় মাত্রা, সর্বত্রগামী শিব তথা মহেশ্বর-এর প্রতীক। মহাশক্তি ও রুদ্রের প্রতিরূপ। ব্রহ্ম, চাঁদ বা চন্দ্রমণ্ডল ইত্যাদিও চিহ্নিত করে। অগ্নিপুরাণ অনুসারে এই বর্ণ শুধু শিব নয়, স্থিতি বা সুরক্ষাও ধারণ করে। সাধারণভাবে এটি প্রজ্ঞার উন্মেষ, অন্তর্মুখী যাত্রা, বিশ্বজনীন চেতনা, এমনকি দিব্য আধ্যাত্মিক আলোর জাগরণ, পরম আত্মার দিকে অভিমুখী হওয়া ইত্যাদিও আভাসিত করে। আমরা সাধারণত জানি—'ছাত্রাণাং অধ্যায়নং তপঃ'। অধ্যয়নই শিক্ষার্থীদের তপস্যাতুল্য ব্রত। তা সে সাধারণ শিক্ষার্থী হোক, বা উচ্চমার্গের কোনও ভক্ত শিক্ষার্থী হোক। এক্ষেত্রে কোনও কোনও শিক্ষার্থী কেবল হ্যাঁ-তে হ্যাঁ না মিলিয়ে, সম্মতি জ্ঞাপন না করে একটু অন্যভাবে আওয়াজ তোলে, জিজ্ঞাসা করে, দাবি করে, গর্জন-শব্দ-চিৎকার ইত্যাদিও করে, গুরুবাদ থেকে আলাদা হতে প্রয়াস করে। সেও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী, তবে গড়পড়তা নয়।

তান্ত্রিক মতে, র ঈশ্বর তথা শিবের ধারক তথা এক অবিচল শক্তি, যা পুরো সৃষ্টিকে ধারণ করে, মহাজাগতিক চক্রকে সচল রাখে। এটি মণিপুর চক্রের সাথেও জড়িত। রয়েছে চন্দ্রের স্নিগ্ধতা, প্রশান্তি। তবে র অগ্নিতত্ত্বের মূল বীজ। সেজন্য র-তে তীক্ষ্ণতা, তেজ, বহ্নি বীজ, মহাশূন্যের আলো, সূর্যের জ্যোতি ইত্যাদি বোঝায়।

এই বর্ণ ব্যক্তিগত শক্তি বা জ্যোতি, আত্মবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করতে সমর্থ। এই ধরনের জাগরণ ঘটলে শারীরিক মানসিক স্তরে আবদ্ধ সকল নেতিবাচক 'পাপ' দহন করে শুদ্ধি আনয়ন সম্ভব হয়। জেগে ওঠে আত্মার নিহিত সুশক্তি তথা জ্যোতি। এইভাবে জাগতিক অজ্ঞতার অন্ধকার বর্জন করে আত্মপ্রজ্ঞা অর্জন সম্ভব হয় শিষ্য বা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। এদের জীবনের

স্থূলাবস্থা থেকে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক স্তরে পৌঁছানোর জন্য ভেতরের যে উত্তাপ বা সাধনার প্রয়োজন হয় তাও এই বর্ণে নিহিত রয়েছে। বলাবাহুল্য যে, ইংরেজি ‘আর’ বর্ণে আধারিত হয়ে থাকে সম্ভাব্যতা, নিয়ন্ত্রণ, জাগরণ, পুনরুত্থান, সাহস, জীবনীশক্তি বা প্রাণশক্তি ইত্যাদি।

আবার র কেবল আলো, তেজ, রশ্মি বা ঔজ্জ্বল্য নয়, আরাম, শান্তি, বিশ্রাম, সুস্থির ইত্যাদি অর্থও ধারণ করে (প্রসঙ্গটি আমরা ‘রাম : প্রসঙ্গ বর্ণাক্ষরার্থ ও প্রেক্ষিত একাল’, ‘বিশ্ব হিন্দু বার্তা’-র বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৫১/৯ সংখ্যায় আলোচনা করেছি)। গুরুর প্রদত্ত শিক্ষা পেয়ে শিক্ষার্থী অনেক সময় মানসিক স্থিরতা বা শান্তি লাভ করে থাকে। আবার এই র-তে রয়েছে দান বা প্রদান সূচক অর্থ। গুরু যে জ্ঞান প্রদান করেন তা আসলে ‘চারি বেদ ষটশাস্ত্রে’-র মতো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হন শিক্ষার্থী বা শিষ্য।

এইভাবে আলোকপাত করলে বলা যায়, ‘গুরু’ শব্দের বর্ণ-রূপোপাদানের মধ্যেই গুরুর তাত্ত্বিক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বহুমুখী কর্ম-সম্পাদনের আভাস নিহিত রয়েছে, যা উপযুক্ত আলোচনায় প্রতিফলনের প্রয়াস করা হয়েছে মাত্র। ■

গুরু কৃপাহি কেবলম্

রবিব্রত ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠের কাশী অদ্বৈত আশ্রমে উপস্থিত রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং বেলুড় মঠের প্রথম অধ্যক্ষ আমি ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ। এমন সময় একটি ছেলে এল যাকে দেখে ব্রহ্মানন্দজী বললেন, জানকীবাবুর ছেলে বলে মনে হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে যেন উপযুক্ত আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

কিছু পরে জানকীবাবুর সেই ছেলের সাথে ব্রহ্মানন্দজীর সাক্ষাৎ হল। ছেলেটি বারবার রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করে সন্ন্যাস নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করার ইচ্ছা জানাচ্ছিল। ব্রহ্মানন্দজী তার কথা শুনলেন না বরং তাকে বললেন যে তোমার জন্য একটা আলাদা কাজ অপেক্ষা করে আছে তুমি ফিরে গিয়ে সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হও। সেই ছেলেটি আর কেউ নয় সুভাষচন্দ্র বসু। আশা করি যাঁর পরিচয় নতুনভাবে কিছু বলার নেই। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন ব্রহ্মানন্দজী তাকে জীবনে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন। প্রিয় পাঠক আমাদের কারো কারো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন রাজকোটের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজীর নির্দেশের কথা মনে আসতে পারে। আমরা এখানে বোঝাতে চাইছি গুরু সঠিক অর্থে কিভাবে উপযুক্ত জীবনযাপনের নির্দেশ দেন। গুরুর কাজ শিষ্যকে তার নিজের অনুগত করা নয় বরং শিষ্যকে তার উপযুক্ত জীবনের দিকে এগিয়ে দেওয়া। সেই পথে থেকে সহায়তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে লক্ষ করলে এটা খুব সুন্দর ভাবে বোঝা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ কাকে কি উপদেশ দিচ্ছেন সেটা শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখে রাখতেন যাকে আকর ধরে নিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত লেখা হয়েছিল। রামকৃষ্ণ তাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন বলতো ওইদিন আমি কি বলেছিলাম। এসব দেখে তার আর এক শিষ্য তারক যিনি পরবর্তীকালে স্বামী শিবানন্দ নামে পরিচিত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ, তিনিও লেখালেখি করা শুরু করলেন। এসব জানতে পেরে ঠাকুর একদিন তাকে বললেন যে ওটা তোর কাজ নয়।

অদ্বৈত বেদান্তের উপর অনেক বড় বই নরেন্দ্রনাথকে পড়তে দিতেন অন্য কাউকে দিতেন না। নরেন্দ্রনাথকে যেমন বেদান্তের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, তেমনই কালীপ্রসাদকে এগিয়ে দিয়েছিলেন যোগের দিকে। অনেকেরই খাদ্যাভ্যাস জীবন যাপনের উপর উনি খেয়াল রাখতেন। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন এসবের বাইরে। বাইরে দোকান থেকে তথাকথিত অখাদ্য খেয়ে এসে বলতে পারতেন আজকে বাইরে অনেক খেয়েছি যদি কোন অসুবিধা থাকে তো বলুন। এমনকি ঠাকুর যেসব জিনিস সহ্য করতে পারতেন না সেগুলো উনি নরেন্দ্রনাথকে দিতেন, কারণ জানতেন সেই জিনিসকে সহ্য করার ক্ষমতা একমাত্র নরেন্দ্রনাথেরই আছে।

নরেন্দ্রনাথকে একবার খুব সুন্দর একটা উপদেশ দিয়েছিলেন, কাশীপুরে তখন শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ওখানেই তার ত্যাগী শিষ্যরা বসবাস করছেন গুরু সেবা এবং জপ ধ্যান সাধন ভজন একসঙ্গে চলছে। একদিন এরকম সময় নরেন্দ্রনাথ এবং কালীপ্রসাদ যিনি পরবর্তী কালে অভেদানন্দ নামে পরিচিত হবেন একসঙ্গে ধ্যান করছেন। এমন সময় নরেন্দ্রনাথ কালীপ্রসাদকে বললেন তাকে একটু স্পর্শ করতে। তার ফল হল কালিপ্রসাদের শরীরে তীব্র কম্পন শুরু হয়। নরেন্দ্রনাথের ভিতরের শক্তিতে অভেদানন্দের ধারণাগুলো পুরো অদল বদল হয়ে যায়। এই ঘটনা জানতে পেরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বললেন দেখ কারোর ভাব নষ্ট করবি না।

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে গুরুর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বলা হয় গুরু ইচ্ছে করলে সমস্ত কিছুকে পাল্টে দিতে পারেন সামান্য স্পর্শের মধ্যে দিয়ে। গুরু হচ্ছেন কপাল মোচন।

বিবেকানন্দের জীবনে এরকম একটি ঘটনা আছে। ঠাকুর একবার তাকে বলছিলেন যে গোটা জগত ঈশ্বরের প্রকাশ। নরেন্দ্রনাথের কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না, উনি বরং ব্যঙ্গ করে বলছেন, যে ঘটিটাও ঈশ্বর বাটিটাও এটা কখনো হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তর্কে গেলেন না বরং বললেন নরেন কি বলছিস রে? বলে একবার তাকে স্পর্শ করলেন। আর গোটা জগতকে চৈতন্যময় দেখা শুরু করলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কল্পতরু হওয়ার ঘটনা লক্ষ করলে দেখা যায় উনি অনেকের মধ্যে চৈতন্যের জাগরণ করতে পেরেছিলেন। কেউ কেউ তাকে সহ্য করতে পেরেছিলেন, কেউ কেউ তাকে সহ্য করতে পারেননি।

এই বৈশিষ্ট্য যে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের একার বৈশিষ্ট্য তা নয় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় লক্ষ করলে দেখা যায় সমস্ত গুরুদেরই এই ক্ষমতাটি ছিল শিষ্যকে সঠিক পথে পরিচালনা করার।

বিবেকানন্দ যখন পরিব্রাজক হিসেবে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেরিয়েছেন তা তখন হিমালয়ের একজন সাধুসঙ্গে তার পরিচয় হয়। তিনি বিবেকানন্দকে সেই সময় ভারতের আরেক বড় সাধক পওহারী বাবার জীবনের একটি ঘটনা বলেছিলেন। গাজীপুরের পওহরি বাবার আশ্রমে একদিন একটা চোর ঢুকেছে। জিনিসপত্র নিয়ে যখন চলে যাচ্ছে সেই সময় পওহারী বাবার ঘুম ভেঙে যায় আর চোর তার চুরি করা জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে দৌড়াতে থাকে। আর পওহরি বাবা চোরের চুরি করা জিনিসপত্র নিয়ে তার পিছন পিছন দৌড়াতে থাকেন। শেষে সমস্ত জিনিস এই চোরকে অর্পণ করে আশ্রমে ফিরে আসেন। এই ঘটনা ওই চুরি করতে যাওয়া মানুষের জীবনে ভীষণ প্রভাব ফেলে। ওই মানুষটি এইসব চুরি করা ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। পরবর্তীকালে তিনিই তার নিজের জীবনের ঘটনা বিবেকানন্দকে শুনিয়েছিলেন।

বুদ্ধের জীবনেও এরকম একটি ঘটনা আছে। সেই সময় অঙ্গুরীমাল বলে এক ভয়ঙ্কর দস্যু ছিল, যার স্বপ্ন ছিল ১০০০টা মানুষকে হত্যা করে তাদের কড়ে আঙুলটির মালা তৈরি করে নিজের গলায় ধারণ করা। যার ভয়ে বনে জঙ্গলে একাকী মানুষ যেত না বা যারা যেত তাদের অনেকেই অঙ্গুরীমালের হাতে নিহত হতো।

বুদ্ধদেবকে বারণ করা হলেও একবার তিনি অঙ্গুরীমালের সন্ধানে চললেন। বনের ভেতরে সেই রাস্তায় অঙ্গুরীমাল বুদ্ধদেবকে ধরবেন বলে পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছেন আর বুদ্ধদেব কিন্তু নিজের গতিতে নির্ভয় ভাবে হেঁটে যাচ্ছেন। অঙ্গুরীমাল দৌড়েও তাকে ধরতে পারল না, তারপর বললো থামো! বুদ্ধ থেমে তার দিকে তাকিয়ে বললেন আমি তো থেমেই আছি, এবার তুমি থামো অন্যায় অধর্ম থেকে। দস্যু অঙ্গুরীমাল দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেলেন শ্রবণ অঙ্গুরীমালে। রাজা প্রসেনজিৎ তাকে ধরতে এসে গ্রেফতার করেছ অবাক হয়ে দেখলেন, দস্যুর বদলে রয়েছে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অঙ্গরীমাল।

চৈতন্যদেবের সময় নবদ্বীপে দুই ভয়ঙ্কর গুন্ডা ছিল জগাই মাধাই। যাদের অত্যাচারে নবদ্বীপবাসী সন্ত্রস্ত থাকতেন। তারা চৈতন্যদেবের বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল, এমনকি চৈতন্যদেবকে তারা আঘাতও করে। কিন্তু তারা নিজেরাই পরিবর্তন হয়ে গিয়ে চৈতন্যদেবের ভক্তে পরিণত হয়।

বুদ্ধদেব তখনও বুদ্ধ হিসেবে পরিণত হননি, তখনো তিনি রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। গয়ায় তার তপস্যা চলছে, সঙ্গে রয়েছেন আরো পাঁচ জন। সুজাতার কাছ থেকে পায়েস গ্রহণ করে খাবার পর সেই সহ তপস্বীদের মনে হয়েছিল যে শ্রমন গৌতম পথভ্রষ্ট হয়েছেন তারা তাকে অবজ্ঞা করে ওখান থেকে চলে যায়। পরবর্তীকালে সিদ্ধার্থ যখন বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তখন তার মনে হয়েছিল তার জ্ঞানের

ভান্ডার কাকে বিতরণ করবেন? তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাকে ফেলে যাওয়া সেই পঞ্চ সাধককে। যোগবলে বুদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন তারা রয়েছে সারনাথে। গোটা রাস্তা হেঁটে বুদ্ধ যখন পৌঁছলেন, সেই পঞ্চ তপস্বী নিজেরা ঠিক করে নিল এই শ্রমনকে তারা প্রশ্রয় দেবেন না, এমনকি বসার জন্য আসন, পান করার জন্য জলও তারা এগিয়ে দেবেন না। তারা যথেষ্ট অসম্মান করেই কথাবার্তা বলা শুরু করলেও বুদ্ধদেব তাদের প্রতি করুণা দেখিয়ে বললেন দেখো তথাগতকে কখনো অসম্মান করো না কারণ সে সত্যকে জেনেছে। এরপরই বুদ্ধ তাদের কাছে তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার উন্মোচন করে তাদেরকে সঠিক পথ দেখালেন। তাদেরকে সাধন পথে এগিয়ে দেওয়া শুরু করলেন।

বেদান্তের অন্যতম ব্যাখ্যাকার আদি শংকরাচার্যের গিরি বলে এক শিষ্য ছিল, যিনি ছিলেন গুরুগত প্রাণ এবং গুরু সেবায় তৎপর। গুরুর সামান্যতম প্রয়োজন ও তার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতো। গুরুর সামান্যতম অসুবিধেও সে এক মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে না পেরে তার সমাধান করার জন্য তৎপর হতো। এই করতে গিয়ে তার শাস্ত্রচর্চা আধ্যাত্ম অনুশীলন অন্য শিষ্যদের মতো হতো না। যার জন্য অন্য শিষ্যরা তাকে একটু হীন চোখেই দেখতো। একদিন গিরি অন্য একটি কাজে ব্যস্ত আছে এবং সে না ফিরে আসা পর্যন্ত শিষ্যদের পাঠদান করতে রাজি হননি আচার্য। এই অবস্থায় আত্ম অহংকারী এক শিষ্য তাকে গিরির শাস্ত্র জ্ঞানের অপতুলতা সম্বন্ধে কটু বাক্য নিবেদন করেন। শংকর তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে গিরিকে তার কাছে আসার জন্য নির্দেশ দেন। গুরুর সেবার কাজ ছেড়ে গুরুর কাছে শাস্ত্র পাঠের জন্য আসতে আসতেই গিরির মনে চরম অনুভূতি লাভ হয়। সে প্রাচীন তোটক ছন্দে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা শুরু করেন। যাবতীয় শিষ্যরা অভিভূত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এই শিষ্যের নাম হয়েছিল টোটোকাচার্য।

গুরু তত্ত্বে, গুরু কিভাবে শিষ্যদের কৃপা করেন বা তার কৃপা কটাক্ষে কিভাবে শিষ্যদের জীবন মহিমান্বিত হয়ে ওঠে তার অনেক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা সেই ব্যাখ্যায় গিয়ে বিখ্যাত গুরুদেব জীবনের বাস্তব উদাহরণে শিষ্যদের কিভাবে পরিবর্তন পরিবর্তন এসেছিল এই কথা বোঝার চেষ্টা করবো আসন্ন গুরু পূর্ণিমার প্রেক্ষাপটে। ■

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের পরিচিতি বর্গ, দক্ষিণ নদিয়া, মধ্যবঙ্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের পরিচিতি বর্গ
সুন্দরবন জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

যোগ দিবস পালন, চন্দননগর, দক্ষিণবঙ্গ

প্রযুক্তির যুগে গুরু-পূর্ণিমার প্রাসঙ্গিকতা

অধ্যাপক সমীরণ রায়

গুরু পূর্ণিমা হল সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে গুরু বা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি পবিত্র দিন। প্রচলিত হিন্দু ঐতিহ্য অনুসারে, মহর্ষি ব্যাস-এর জন্মতিথি উপলক্ষে এই দিন পালিত হতে শুরু হয়। ব্যাসপূজার ভিত্তি পুরাণ সাহিত্যে সুস্পষ্ট। মহর্ষি ব্যাসদেব বেদের সংকলক, বিভাগকর্তা এবং মহাভারতের রচয়িতা মহান আচার্য হওয়ায় তাঁকে 'জগৎগুরু' বলা হয়। তাই তাঁর স্মরণে আষাঢ় পূর্ণিমা 'ব্যাস পূর্ণিমা' বা 'গুরু পূর্ণিমা' নামে পরিচিত হয়। এই দিনটি আধ্যাত্মিক গুরু, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শকদের সম্মান জানানোর দিন। শিষ্যরা গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং তাঁদের শিক্ষা স্মরণ করেন। পূজা, ধ্যান, জপ, ধর্মীয় আলোচনা, দান-ধ্যান ও সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে আবার অনেক আশ্রম ও মঠে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ গুরু রূপে হিন্দু জাতির ঐতিহ্য, গৌরব, সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের প্রতীক পরম পবিত্র গৈরিক (ভগোয়া) ধ্বজাকেই পূজা করে।

'গুরু' একটি সংস্কৃত শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো—ভারী, গুরুতর, মহান, সম্মানীয়, শিক্ষক বা আচার্য। অর্থাৎ যিনি জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও চরিত্রে গুরুত্বপূর্ণ বা মহান তিনিই গুরু। বিভিন্ন উপনিষদ, গুরু গীতা সহ বহু আধ্যাত্মিক গ্রন্থে গুরু-র ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—

''গুকারস্ত্বন্ধকারঃ স্যাদ্ রুকারস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাত্ গুরুরিত্যভিধীয়তে।।''

'গু' অর্থাৎ অন্ধকার (অজ্ঞান) এবং 'রু' অর্থাৎ সেই অন্ধকারের নাশকারী। সুতরাং যিনি অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করেন তিনিই গুরু।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল গুরু-শিষ্য পরম্পরা। প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞান, শিক্ষা, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশে এই পরম্পরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। গুরু কেবল একজন শিক্ষক নন; তিনি শিষ্যের জীবনগঠনের পথপ্রদর্শক, আদর্শ এবং অনুপ্রেরণার উৎস। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার রূপ বদলেছে, কিন্তু গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মৌলিক গুরুত্ব আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গুরুপূর্ণিমার ইতিহাস ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

হিন্দু দর্শনে গুরুকে জ্ঞানের আলো প্রদর্শনকারী হিসেবে দেখা হয়। গুরুগীতা-তে গুরুর মাহাত্ম্য একটি সুপরিচিত শ্লোকের মাধ্যমে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে—

''গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু
গুরু দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।''

অর্থাৎ, গুরুই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমতুল্য; তিনি পরব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ।

গুরু শিষ্যদের উপদেশ প্রদান করছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের মহান উক্তি—

''মাতৃদেবো ভব।
পিতৃদেবো ভব।
আচার্যদেবো ভব।।''

অর্থাৎ মাতাকে দেবতা জ্ঞান কর, পিতাকে দেবতা জ্ঞান কর, আচার্যকে দেবতা জ্ঞান কর। এটি ভারতীয় গুরু-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন ভিত্তি।

সংস্কৃত সাহিত্যে গুরুকে কেবল শিক্ষক নয়, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে যাওয়া পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখা হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে

''অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।''

তাই বর্তমান সমাজে গুরুপূর্ণিমার তাৎপর্য হল—জ্ঞান, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও মানবিকতার ধারাকে জীবিত রাখা।

বৌদ্ধ ধর্মেও এই দিনটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। বিশ্বাস করা হয় যে গৌতমবুদ্ধ বোধিলাভের পর প্রথম ধর্মদেশনা বা ধর্মোপদেশ এই সময়ে প্রদান করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল গুরুকুল। সেখানে শিষ্যরা গুরুর আশ্রমে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। শিক্ষা কেবল পুঁথিগত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং চরিত্রগঠন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা এবং জীবনদর্শনের শিক্ষাও সমান গুরুত্ব পেত। গুরু শিষ্যকে

নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন এবং শিষ্য গুরুকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে অনুসরণ করত। এই সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক বিশ্বাস, সম্মান এবং আদর্শের ভিত্তিতে। যার নিদর্শন বা গুরু-শিষ্য সম্পর্ক ছান্দোগ্য, কঠ ও মুণ্ডক্য উপনিষদে জ্ঞানলাভের জন্য গুরুর কাছে গমনের নির্দেশ আছে। যেমন মুন্ডক্য উপনিষদে বলা হয়েছে—

'তদ্বিজ্ঞানার্থ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ'

অর্থাৎ সত্যজ্ঞান লাভের জন্য অবশ্যই গুরুর কাছে যেতে হবে।

আদি শঙ্করাচার্য-এর প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহ এবং পরবর্তী বৈষ্ণব, শৈব ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে আষাঢ় পূর্ণিমায় গুরুপূজার প্রথা ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। এখান থেকেই আধুনিক 'গুরু পূর্ণিমা' সর্বভারতীয় উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। অনেক আধ্যাত্মিক পরম্পরায় গুরুপূর্ণিমা আত্মবিশ্লেষণ, সাধনা ও আত্মোন্নয়নের দিন হিসেবে পালিত হয়। ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা ও সম্ভাবনা নিয়ে ভাবার সুযোগ পায়।

বর্তমানে ইন্টারনেট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অনলাইন শিক্ষা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন অনেক সহজ হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের তথ্য ও শিক্ষা লাভ করতে পারছে। তবে তথ্যের সহজলভ্যতা জ্ঞানের বিকল্প নয়। সঠিক তথ্য নির্বাচন, তার যথাযথ ব্যাখ্যা এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের জন্য একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক বা পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয়। এই কারণেই প্রযুক্তির যুগেও গুরুর ভূমিকা অপরিসীম।

গুরুপূর্ণিমা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে একজন প্রকৃত শিক্ষক কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানই প্রদান করেন না, তিনি নৈতিকতা, মানবিকতা, শৃঙ্খলা এবং জীবনদর্শনের শিক্ষাও দেন। আধুনিক সমাজে প্রযুক্তির অপব্যবহার, নৈতিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের সংকটের সময়ে শিক্ষকদের এই ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এছাড়া গুরুপূর্ণিমা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষক, অভিভাবক এবং অন্যান্য পথপ্রদর্শকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা লাভ করে। ফলে সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে।

সুতরাং বলা যায়, প্রযুক্তির যুগে শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি পরিবর্তিত হলেও গুরুর প্রয়োজনীয়তা কখনো কমে না। এই উৎসব পালনের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সৎ, নৈতিক ও মানবিক মানুষ হয়ে ওঠার জন্য একজন যোগ্য গুরুর দিকনির্দেশনা অপরিহার্য। তাই বর্তমান যুগেও গুরু পূর্ণিমার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। আজকের ব্যস্ত ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনে আমরা প্রায়ই আমাদের শিক্ষক, গুরু, অভিভাবক বা পথপ্রদর্শকদের অবদান ভুলে যাই। গুরুপূর্ণিমা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। তথ্যের প্রাচুর্যের যুগে তথ্য (information) পাওয়া সহজ, কিন্তু সঠিক জ্ঞান (wisdom) অর্জন কঠিন। গুরু পূর্ণিমা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে জ্ঞান অর্জনের জন্য একজন যোগ্য পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন আজও রয়েছে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রায়শই কর্মসংস্থানমুখী হলেও চরিত্রগঠন, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গুরু পূর্ণিমা এই দিকটির গুরুত্ব তুলে ধরে।

বর্তমান যুগে শিক্ষার পরিধি ও পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনলাইন শিক্ষার প্রসারের ফলে শিক্ষালাভের সুযোগ অনেক বেড়েছে। প্রযুক্তির সাহায্যে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের ফলে গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অনেকাংশে কমে গেছে। আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক প্রায়শই শ্রেণিকক্ষ বা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তবে বর্তমান বাস্তবতায়ও একজন শিক্ষকের গুরুত্ব অপরিসীম। তথ্যের ভাণ্ডার থেকে সঠিক জ্ঞান নির্বাচন, যুক্তিবোধের বিকাশ, নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা এবং জীবনের সঠিক পথনির্দেশের জন্য একজন যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। প্রযুক্তি তথ্য দিতে পারে, কিন্তু একজন গুরুর মতো প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে পারে না। তাই আধুনিক যুগেও শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বর্তমান সমাজে গুরু-শিষ্য পরম্পরার চেতনা নতুনভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং শিক্ষককেও শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে আন্তরিকভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। পারস্পরিক সম্মান, বিশ্বাস এবং সহযোগিতার মাধ্যমে এই সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে পারে। যা মানবকল্যাণে অত্যন্ত আবশ্যিক। ■

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ : ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী

বাঙালি হিন্দুদের একমাত্র হোমল্যাণ্ড পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন? বাঙালি হিন্দুর হোমল্যাণ্ডের স্রষ্টা হলেও কতটা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন তিনি, কোন পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁকে বঙ্গ বিভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করতে হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে প্রথমেই আসে 'শ্যামা হক' মন্ত্রীসভার কথা।

শরৎ বসু, শ্যামাপ্রসাদ ও ফজলুল হক মিলে হিন্দু-মুসলমান যুক্ত ভাবে বাংলা শাসন করবে—এই ছিল প্রথম ও শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু মুসলিম লিগের পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে তা সফল হতে পারেনি। এই মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে হক সাহেব বলেছিলেন, 'শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম বাংলার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিয়াছেন, আর আমি নিয়াছি হিন্দু বাংলার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব।'

অবিভক্ত বাংলার অন্যতম মুসলিম রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমি শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম তাঁর সম্বন্ধে হক সাহেব যা বলিয়াছেন তা একদম ঠিক। সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে সত্যসত্যই তিনি অনেক কংগ্রেসী নেতার চেয়েও উদার। হিন্দু সভার নেতা হইয়াও কোন হিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব, আমার এই অভিজ্ঞতা হইল প্রথম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়া।'

১৬ আগস্ট ১৯৪৬, মুসলিম লিগের গুণ্ডাদের হাতে নির্মম হিন্দু নিধনের পর থেকেই বঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ বাংলাকে ভাগ করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুদের হোমল্যাণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে। মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদের 'হিন্দুমহাসভা' বঙ্গভঙ্গের দাবি করে এবং এই দাবির সমর্থনে প্রচার শুরু করে।

উল্লেখ্য প্রায় একই সময়ে বাংলার কংগ্রেসও বঙ্গবিভাজনের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে। লক্ষণীয় এই যে, বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের এই কার্যকরী সভায় উপস্থিত ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, কে.সি.নিয়োগী, এম.এল.এ. ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, ডাঃ পি.এন.ব্যানার্জি, কুমার দেবেন্দ্র লাল খান, এম.এল.এ মাখন লাল সেন ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

২২ এপ্রিল ১৯৪৭, নূতন দিল্লির এক জনসভায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন, পাকিস্তান যদি গঠিত নাও হয়, মুসলিম লিগ যদি মন্ত্রী মিশন পরিকল্পিত দুর্বল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মেনেও নেয়, তাহলেও বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে।

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার পৌষ ১৩৫৩, সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল, 'গান্ধীজি গ্রুপ ভাঙিয়া আসামকে স্বাধীন হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। মাইনরটি মুসলমান ভারতে সেফ গার্ড খুঁজিতেছে, সে যুক্তিতে বঙ্গের হিন্দুদের সেফ গার্ডের দাবি। সম্প্রতি বাংলার কয়েকজন নেতা পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী। কারণ বাংলার লিগ সংখ্যাধিক্য শাসনাধীনে বাঙালি হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবি জানাইতেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, মেজর জেনারেল এ.সি. চ্যাটার্জি, ডঃ প্রমথ নাথ বাড়ুজ্জ্যে প্রমুখ ব্যক্তি এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।'

শ্যামাপ্রসাদের এই আপোষহীন দুর্বার আন্দোলনের ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল বাংলা তথা সমগ্র ভারতে। ভুক্তভোগী হিন্দু সমাজ যেমন এই আন্দোলনে উজ্জীবিত হল, তেমনই সিঁদুরে মেঘ দেখল দাঙ্গাবাজ মুসলিম লিগ এবং তাদের নেতৃবৃন্দ। এবং শ্যামাপ্রসাদের এই আপোষহীন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেরি হল না। বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম লিগ নেতারা হঠাৎ ছুরি লাঠি ছেড়ে অহিংস ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে গেলেন। অসহায় হিন্দুর রক্তে যাঁর হস্ত রঞ্জিত সেই সুরাবর্দি বললেন, তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীন সোনার যুক্তবঙ্গ গড়বেন। আর এক কুখ্যাত কুচক্রী আবুল হাসিম বললেন, যুক্ত বাংলায় অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির বেহস্ত তৈরি হবে।

এ যেন ভূতের মুখে রাম নাম। বাংলার মসনদ হাতছাড়া হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখে এঁরা কি ভুল বকতে শুরু করেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর তো ১৬ আগস্ট ১৯৪৬, এবং ১০ অক্টোবর ১৯৪৬ তারিখের ইতিহাসের পাতাতেই পাওয়া যাবে। আর সেই ইতিহাসের রূপকার তো এই সুরাবর্দি আর হাসিম। এই সুরাবর্দি আর হাসিমের আসল রূপ তো মানুষের চেনা।

তৎকালীন লাট সাহেব ফ্রেডরিক বারোজ ভেবেছিলেন ঢাকায় কিরণশঙ্কর রায়ের জমিদারী স্বার্থের দুর্বলতায় এবং কলকাতায় শরৎ বসুর রাজনৈতিক পুনর্বাসনের আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা রূপায়ণ মারফত মুসলমানদের মনোরঞ্জন করে ব্রিটিশ বাণিজ্য সম্প্রসারিত করবেন। তার ফলে বাংলার হিন্দু স্বার্থ জলাঞ্জলি হলে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু তার এই স্বপ্নের পরিকল্পনার মূলে কুঠারাঘাত করলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

নিজের দল হিন্দু মহাসভা ক্ষীণশক্তি হলেও একমাত্র ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জোরে শ্যামাপ্রসাদ বাংলার কংগ্রেস দলকে বাংলা ভাগ আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন।

দেশভাগ যখন অনিবার্য, তখন বাংলাকে ভাগ করে যত বেশি সংখ্যক হিন্দুকে ভারতের মধ্যে রাখা যায় সেই প্রচেষ্টায় অপরাধ কোথায়? ডঃ শ্যামাপ্রসাদ সেই কাজটাই করেছেন। তাই আজ তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা নিরাপদ পশ্চিমবঙ্গে বসে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার মহড়া দিচ্ছেন। তা না হলে তাদের দশাও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মতই হতো, সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে হতো। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ সেই অভিশাপ থেকে বাঙালি হিন্দুদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেছেন।

এই সন্দেহ অমূলক নয় যে যুক্তবঙ্গ হলেই সুরাবর্দি, ওসমান আর কলুটোলা, কলাবাগান, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, বেলেঘাটা, বেলগাছিয়া, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জের মুসলমান গুণ্ডার দল রাতারাতি অহিংসার পূজারী হয়ে যাবে, একথা অতিবড় পাগলেও বিশ্বাস করবে না। তাই শ্যামাপ্রসাদের ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছিল। দিশাহারা হিন্দু বাঙালি সেদিন তাঁকেই পরিত্রাতা রূপে বেছে নিয়েছিল। বাঙালি হিন্দুর পরিত্রাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ■

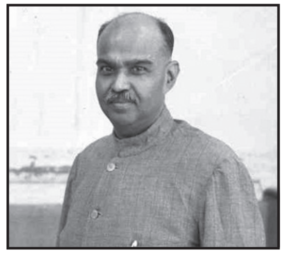

লহ প্রণাম শ্যামাপ্রসাদ

পিনাকী চ্যাটার্জী

ভারত কেশরী জনসংঘ প্রতিষ্ঠাতা
এই বাংলার স্রষ্টা তুমি, তুমিই মোদের ত্রাতা
নব বাংলা তৈরি আজ তোমার আশীর্বাদে
সুশাসন ফিরবে মোদের ভরসা রাষ্ট্রবাদে
জয় শ্যামাপ্রসাদের জয়, জয় ভারত মায়ের জয়।।

এই বাংলার বিভাজন আটকেছিলে তুমি
ষড়যন্ত্রের সঠিক জবাব দিয়েছিলে তুমি
বাঙালি হিন্দু জাতি আর ভুলবে নাতো
অন্তরের শ্রদ্ধা তোমায় জানাই প্রনাম শত
সোনার বাংলা গড়বো মোরা তোমারই আদর্শে
স্বপ্ন তোমার সত্যি হবে বাঙালির বিকাশে।।

কুড়ি জুন উনিশশো সাতচল্লিশে
বাংলা ভূমির স্বাধীনতা ফিরিয়েছিলে দেশে
বাঁচবো মোরা গর্বে এবার বাঁচবো মোরা মানে,
পশ্চিমবঙ্গ রইবে তার ভারত মায়ের প্রাণে
সোনার বাংলা গড়বো মোরা তোমারই আদর্শে
স্বপ্ন তোমার সত্যি হবে বাঙালির বিকাশে
জয় শ্যামাপ্রসাদের জয়, জয় ভারত মায়ের জয়।।

শোকসংবাদ

রঘুনাথগঞ্জ জেলা বজরঙ্গ সংযোজক শ্রী দেবব্রত সিংহ রায়ের পিতা পরলোকগমন করেছেন, দেবব্রত ভাইয়ের পিতার পুণ্য আত্মার শান্তি কামনা করি এবং এই দুঃখের সময় দেবব্রত ভাই ও তার পরিবারকে ঈশ্বর শান্ত্বনা প্রদান করুক এই প্রার্থনা করি।

সনাতনের ঐতিহাসিক বিজয় : ভোজশালাকে মন্দিরের মান্যতা

দিলীপ কুমার ঝাঁওর

বর্তমান মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ১০৩৪ খ্রিস্টাব্দে পরমার বংশের রাজা ভোজ জ্ঞানের সাধনা এবং মাতা সরস্বতীর আরাধনা করার জন্য ভোজশালার নির্মাণ করেছিলেন। এই ভোজশালাটি নালন্দা, তক্ষশীলা এবং কাশীর মতনই এক বিশাল আবাসিক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। শত শত লাল স্তম্ভগুলোর উপর বিভিন্ন দেবী-দেবতাদের মূর্তি সজ্জিত আছে। এই ভবনে মাঘ, বানভট্ট, কালিদাস, ভবভূতি, ভাস্করভট্ট, ধনপাল, মাতুঙাচার্যদের মতো বিদ্বান অধ্যায়ন এবং অধ্যাপনা করতেন। ভবনের উত্তর এবং দক্ষিণের দেওয়ালে দেবী-দেবতাদের মূর্তি খোদাই করা আছে। ভবনের মধ্যস্থলে বিশাল যজ্ঞকুণ্ড আছে। ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দে এখানে মাতা সরস্বতীর অপ্রতিম সৌন্দর্যের পূর্ণ প্রতিমা ছিল, যাতে বসন্ত পঞ্চমীর দিনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মহারাজা ভোজ শৌর্য এবং পরাক্রমের পাশাপাশি ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য তথা শিল্পকলায়ও পারদর্শী ছিলেন। জানা যায় যে, মাতা সরস্বতী তাঁর অন্যতম উপাসক রাজা ভোজকে অনেকবার দেখা দিয়েছিলেন। পবিত্র ভোজ শালার প্রাঙ্গণ ধর্ম, দর্শন এবং শাস্ত্রচর্চা করার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বৈদিক মন্ত্র ভোজ শালায় সবসময় উচ্চারিত হত।

ইসলামিক ষড়যন্ত্রকারী কামাল মৌলানা, মাতা সরস্বতীর আরাধনা করার ছলে ভোজ শালায় প্রবেশ করে। মৌলানা তন্ত্র মন্ত্রের সাধনার ছলে ছত্রিশ বছর ধরে মালওয়া রাজ্যে ধর্মান্তকরণের কাজ করতে থাকে এবং গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করে আলাউদ্দিন খিলজিকে প্রদান করে। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে খিলজি মালওয়ার উপর আক্রমণ করে এবং হিন্দুদের মন্দির এবং আস্থার কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করে, তার মধ্যে ভোজশালাও ছিল। তারপর ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে দিলাবর খাঁ গৌরী মালওবা জয় করে এবং সূর্য মন্দির, যাকে বিজয় মন্দিরও বলা হয় তাকে ধ্বংস করে এবং সেখানে নামাজ পড়া শুরু করে। বর্তমানে ওই বিজয় মন্দিরকে লাট মসজিদ বলা হয় এবং সেখানে নামাজ পাঠ চলে। আবার ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ শাহ খিলজি (দ্বিতীয়) ভোজশালার মন্দিরকে ধ্বংস করে মসজিদ বানানোর প্রয়াস করে। কামাল মৌলানার মৃত্যুর ২০৪ বছর পর তার স্মৃতির মকবারা (কবর) বানায়। এই তথ্যের আঁধারে মন্দির ভোজশালাকে মসজিদ বলা শুরু হয়।

হিন্দু সমাজ বিগত ১০০০ বছর ধরে ভোজ শালার উপর তাদের অধিকার স্থাপিত করার জন্য লাগাতার সংঘর্ষ চালিয়ে গেছে। ছয়ের দশকে আর.এস.এস এবং হিন্দু মহাসভা ‘শ্রীমহারাজ ভোজ স্মৃতি বসন্তোৎসব সমিতি’ গঠন করে এবং পুনরায় প্রয়াস চালু করে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ভোজশালার বিবাদ নিয়ে প্রশাসন হিন্দুদের প্রতি মঙ্গলবার এবং মুসলমানদের প্রতি শুক্রবার সেখানে প্রবেশ করে ধর্মাচরণের অনুমতি দেয়। কিন্তু ১২ই মে, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং, মুসলিম তুষ্টিকরণের জন্য, ভোজশালাতে মঙ্গলবার হিন্দুদের প্রবেশকে নিষিদ্ধ করে দেয়। অথচ মুসলিমদের প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়ার অনুমতি বজায় রাখেন। হিন্দুদের তীব্র প্রতিবাদের ফলে কেবলমাত্র বসন্ত পঞ্চমীতে হিন্দুদের প্রবেশ আবার চালু করা হয়। যদিও এরপরেও কিন্তু সনাতনীদের আন্দোলন চলতে থাকে। তার ফলে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের ফুল-মালা বা কোন রকম পূজা সামগ্রি না নিয়ে পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়। এছাড়া পর্যটকদের প্রবেশ করার অনুমতিও প্রদান করা হয়। এরপর ২০১৩ এবং ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বসন্ত পঞ্চমীর দিনে ভোজশালাকে নিয়ে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি হয়। তারপর অনেক জনজাগরণ এবং আন্দোলন শুরু হয়। গত ১৫ই মে, ২০২৬ মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর উচ্চ আদালত ভোজশালার নিয়ে তাদের রায় ঘোষণা করেন। আদালত ASI-এর বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণের রিপোর্টের উপর আস্থা রেখে ভোজশালাকে হিন্দু মন্দির বলে মান্যতা দেন। মাননীয় বিচারপতি বিজয় কুমার শুক্লা এবং বিচারপতি অলোক অবস্তি যৌথভাবে ২৪ দিন ৪৩ ঘন্টার শুনানির পর এই নির্ণয় দেন। মুসলমান পক্ষকে নামাজ পড়ার জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন তাঁরা। এই রায় ASI-এর ৯টি বিশেষ প্রমাণের সাপেক্ষে দেওয়া হয়।

১) গত ১৫ জুলাই ২০২৪, ASI তার ২১৮৯ পৃষ্ঠার রিপোর্টে বলেন, বর্তমান ঢাঁচার নিচে দশম এবং একাদশ শতাব্দীর পরমার কালীন নির্মাণের প্রমাণস্বরূপ বিশাল

বেসাল্ট পাথর। প্রাচীন ইট এবং মন্দির শৈলীর স্তর বা নিম দেখা গেছে।

২) ওই স্থানে সংস্কৃত শিলালেখে সারদা সদন বলে উল্লেখ পাওয়া গেছে। বাস্তবে সারদা দেবী, মাতা সরস্বতীরই অপর নাম। যে কোন ধার্মিক শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য এই ধরনের উল্লেখকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়।

৩) সাহিত্যিক গ্রন্থ 'পারিজাত মঞ্জুরী'র শিলালেখ ওই পরিসরে পাওয়া গেছে। তার প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, ওই নাটকের প্রথম মঞ্চ উপস্থাপন এই সরস্বতী মন্দিরেই হয়েছে। ASI এটিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা প্রমাণ করে পরিসরে সাহিত্য, নাট্য এবং বিদ্যার গতিবিধির বড় কেন্দ্র ছিল।

৪) এই মন্দির পরিসরে ১০৬টি স্তম্ভ এবং ৮২টি শিলাস্তরের উপরে হিন্দু মন্দিরের বাস্তু কলার সম্পর্কিত দেবী-দেবতার আকৃতি এবং পারম্পরিক স্থাপত্যের প্রতীক দেখা গেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে এইগুলোকে মূল মন্দির থেকে বের করে নির্মাণ কাজে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ অনেক স্তম্ভের দিশা এবং আধারের মধ্যে অসংগতি পাওয়া গেছে।

৫) ASI-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত শিলালেখ গুলোকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ঘষাঘষি করা হয়েছে। অনেক পাথরকে দেওয়ালে এবং মেঝের উপর ওলট পালট করে লাগানো হয়েছে, যাতে লেখাগুলি পড়া না যায়। অনেক স্তম্ভের উচ্চতা, অবস্থানের দিক এবং নকশা একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাব দেখা গেছে। অর্থাৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পাথর, স্তম্ভ এবং শিলালেখগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে বর্তমান ঢাঁচা তৈরি করা হয়েছে।

৬) দেব দেবীর মূর্তিগুলোর ধার্মিক আকৃতিগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। অনেক ছবির প্রতিকৃতিগুলোর হাত-মুখ বিকৃত, ধার্মিক প্রতীকগুলিকে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে কাটা হয়েছে, যাতে মন্দিরের মূল পরিচয় নষ্ট করা যেতে পারে।

৭) ASI এই পরিসর থেকে ১৫০টির বেশি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার শিলালেখ, এবং আরবি ও ফারসি ভাষার ৫৬টি শিলালেখ পেয়েছে। এই শিলালেখগুলো পরীক্ষা করার পর প্রমাণিত হয়েছে, সংস্কৃত ও প্রাকৃত শিলালেখগুলো অনেক পুরোনো, যা মূল মন্দিরের সময়কালীন। অথচ আরবী ও ফারসী শিলালেখগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক নতুন।

৮) স্তম্ভ এবং দেওয়ালে ১৩৯টি চক্র চিহ্ন এবং ৭৯টি ত্রিশূল, স্বস্তিক চিহ্ন এবং অন্যান্য সনাতনী প্রতীক চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা তৎকালীন কারিগরদের নির্মাণ চিহ্ন বা কোন সাংকেতিক ভাষা বলে ASI বলেছেন।

৯) ASI এই পরিসরে ৯৪টি মূর্তি বা কলাকৃতি পেয়েছে। তার মধ্যে ভগবান গণেশ, ব্রহ্মা, নৃসিংহ, ভৈরব, চতুর্ভুজ যুক্ত দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে, যা মন্দির নির্মাণের সময়কালীন।

ইন্দোরের উচ্চ আদালত এই সমস্ত তথ্যগুলোকে সুপ্রিমকোর্টের অযোধ্যার রামমন্দির নির্ণয়ের সঙ্গে তুলনা করে তাদের রায় দিয়েছেন বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু বাস্তবে এটিকে সনাতনীদের ঐতিহাসিক বিজয় বলেই ভাবা উচিত। আদালতের এই সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দুরা এখন ভোজশালার মন্দিরে পুজো চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেছেন এবং লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে মা সরস্বতীর মূর্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পথ প্রশস্ত করেছে। ■

যোগ দিবস পালন, লালবাগ, ব্রহ্মপুর জেলা, মধ্যবঙ্গ

গুরু : জ্ঞানের প্রকাশ স্তম্ভ

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

'গুরু' সংস্কৃত ভাষার একটি শব্দ, যার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ আছে এর সন্ধি বিচ্ছেদে। 'গু'-এর অর্থ অজ্ঞান এবং 'রু'-র অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের তেজ যা অজ্ঞান রুপী অন্ধকারকে দূর করে। বাস্তবে গুরু হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি মানুষকে অজ্ঞান রূপী অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞান রূপী আলোর পথে নিয়ে যায়। সেই কারণেই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে 'গুরু পূর্ণিমা' বলা হয়। পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্রিমা হল গুরু, আর শিষ্যরা কালো মেঘের মতো গুরুকে ঘিরে থাকে। এই গুরুপূর্ণিমা দিনটি গুরু-শিষ্যের পরম্পরার জন্য একটি বিশেষ উৎসব পর্ব বলে ভারতবর্ষে পালন করা হয়।

আবার এই পূর্ণ তিথিতে মহর্ষি পরাশরের গন্ধর্ব মিলনে ধীবর কন্যা সত্যবতীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন, ঋষি ব্যাসদেব। ওঁনার জন্ম একটি দ্বীপে হয়েছিল, তাই ওঁনার নাম হয় 'দ্বৈপায়ন'। কিন্তু ওঁনার গায়ের বর্ণ শ্যামলা হওয়ায় ওঁনাকে 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন' বলা হয়। সেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে বিভিন্ন ঋষি মুণিদের কাছ থেকে বেদমন্ত্র সংগ্রহ করেন। সংগ্রহীত বেদমন্ত্রগুলির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, তিনি স্থির করলেন এইগুলিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে সংসারের সামনে তুলে ধরবেন। তিনি ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব—এই নামে সমগ্র বেদকে চারটি বিভাজন করেন। তাই ওঁনাকে 'বেদব্যাস' ঋষি বলা শুরু হয়। ওঁনার এই কৃতিত্বকে সম্মান দেওয়ার জন্য তাঁর জন্মতিথিকে গুরুপূর্ণিমা কিংবা ব্যাসপূর্ণিমা রূপে পালন করা শুরু করে সকলে। শুধু তাই নয় ব্যাসদেব জগতের সবথেকে বৃহৎ গ্রন্থ 'মহাভারতে'র রচয়িতা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শিক্ষার সংকলন করেন, যাকে আমরা 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা' বলে থাকি। এছাড়া তিনি অন্য ১৮টি পুরাণ রচনা করে, সনাতনীদের মার্গ দর্শক হয়েছেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের ধর্ম, সত্য এবং জীবনের আদর্শের শিক্ষা প্রদান করে জগতকে আলো প্রদান করেছিলেন। তিনিই জ্ঞান-ভক্তি এবং ধর্মের পথে চলার প্রেরণা দিয়েছেন। সেই কারণে ওঁনার জন্মদিনে আমরা গুরুজনকে সম্মান প্রদান করে উৎসব পালন করে থাকি।

শিক্ষক বা গুরু কেবলমাত্র জ্ঞানের স্রোত নয়, বরং শিশুর চরিত্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁদের জ্ঞান-জ্যোতি আমাদের জীবনের পথকে মার্গ দর্শন করায়। ইতিহাসে অনেক মহান ব্যক্তির জীবনে গুরুর বিশেষ প্রভাব আমরা দেখেছি। যেমন—ভীষ্ম পিতামহের জীবনে পরশুরাম, অর্জুনের জীবনে দ্রোণাচার্য, চন্দ্রগুপ্তের জীবনে চাণক্য, বিবেকানন্দের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, শিবাজীর জীবনে গুরু রামদাসজি প্রভৃতি।

ভগবান শিব এই গুরু পূর্ণিমা তিথিতেই তার সাতজন শিষ্য অর্থাৎ সপ্তঋষিমণ্ডলীকে জ্ঞান প্রদান করে আদি গুরু অর্থাৎ প্রথম গুরু হন। এই সপ্ত ঋষিরা ওঁনারা প্রদত্ত জ্ঞান নিয়ে সমস্ত ভূলোকে জ্ঞানপ্রভা প্রবাহিত করেন। ভক্তি কালে সন্ত খীসা দাসের জন্ম এই তিথিতেই হয়েছিল। শিখ পন্থে গুরুকে ভগবানরূপে মানা হয় এবং তাদের দশ গুরুর বাণীকে সর্বোচ্চ মান্যতা প্রদান করে থাকেন। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

গুরু গোবিন্দ দোও খড়ে, কাকে লাগু পায়।
বলিহারি গুরু আপনে, গোবিন্দ দিয়ো বতায়।।

অর্থাৎ গুরুই মানুষকে ঈশ্বরের বোধ করিয়েছেন, তাই উনিই প্রথম পুজ্য।

কোন সমাজের বিকাশের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির ভূমিকা অপরিসীম। আবার মানুষকে শিক্ষিত করে তোলেন শিক্ষক বা গুরু। কোন দেশের প্রগতির ধারা সেই দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষিত মানুষই বিশ্বে নিজের দেশের নামকে উজ্জ্বলতা প্রদান করে থাকেন। গুরু বা শিক্ষকের ভূমিকা কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তক পর্যন্ত সীমিত থাকে না, প্রয়োজনে বন্ধু বা অভিভাবকদের ভূমিকাতেও তাঁরা শিক্ষার্থীর পাশে থাকেন। পরিবারের সদস্যদের বাদ দিয়ে শিশুর প্রথম রোল মডেল শিক্ষকই হয়ে থাকেন। যে কোনো শিশু তার শিক্ষকের আদেশকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শিক্ষকের ইংরেজি প্রতিশব্দ টিচার অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যিনি কোন কিছু শেখানোর কার্য করে থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষে শিক্ষকদের জন্য 'গুরু' শব্দের প্রয়োগ প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। গুরু শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ অর্থাৎ যিনি আমাদের জীবনের সম্পূর্ণতা অর্জনের সহায়ক এবং মার্গদর্শক। সেইজন্য সন্ত কবীর দাসজি বলেছেন—

গুরু কুম্ভার, শিষ্য কুম্ভ হ্যায় গঢ়ি গঢ়ি কাঢ়ে ঘোঁট।
অন্তর হাত সহার দে, বাহার বাহেঁ চোট।।

অর্থাৎ শিষ্য কাঁচা মাটির ঘড়ার মতো এবং গুরু কুম্ভকারের মতন। প্রয়োজনে শাসন করেন কিংবা হাত বাড়িয়ে শিষ্যকে সমর্থ্যবান করেন। যেমন—ঘড়াকে পিটিয়ে পিটিয়ে আকার প্রদান করেন কুম্ভকার। শিক্ষকের ভূমিকা সেই কোচের মতো, যিনি খেলোয়ার তৈরির জন্য শিষ্যকে কঠোর পরিশ্রম করান এবং খেলায় সফল হয়ে শিষ্য পুরস্কার পেলে সবথেকে বেশি তিনিই আনন্দলাভ করেন। সেইজন্য হনুমান চালিশাতে বলা হয়েছে—

কৃপা করহু গুরুদেব কি নাই।

অর্থাৎ গুরুর মত কৃপা করুন। কারণ মাতা-পিতার পর শিশুর সফলতায় গুরু সব থেকে বেশি খুশি হন। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ১ কোটির অধিক শিক্ষক আছেন এবং ২৫ কোটির বেশি ছাত্রছাত্রী আছেন। প্রতিবছর প্রায় ১.২৫ কোটি ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। আবার কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী প্রত্যেক বছর শিক্ষা সমাপ্ত করে সমাজের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। গুরু এবং শিষ্যের সফলতা তখনই হয়, যখন উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত করে প্রত্যেক ছাত্র তাঁর জীবিকা অর্জন করে। চাকরি শুধু নয়, শিক্ষা অর্জন করে স্বনির্ভর কাজের মাধ্যমে রোজগার করতে সফল হলেও তার শিক্ষার অর্জন সফল হয়।

আর.এস.এস এই তিথিতে গৈরিক ধ্বজাকে গুরু রূপে পূজা করে, তাঁর পাদদেশে পুষ্পার্ঘ এবং নিধী সমর্পণ করেন। স্বয়ংসেবকরা গুরুর প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা প্রদর্শন বা ব্যক্ত করেন এবং দেশমাতৃকার কাজে নিজেদের নিয়োগ করে গর্ব অনুভব করে থাকেন। ■

বিজ্ঞপ্তি

আগামী আগস্ট মাসে বিশ্ব হিন্দু বার্তার জন্মাষ্টমী সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এই বিশেষ সংখ্যাতে বিজ্ঞাপন (advertisement) সংগ্রহ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ পাঠানোর আহ্বান করা হচ্ছে। আপনাদের সক্রিয় অংশীদারী আমাদের কাম্য। ধন্যবাদ।

যদি উল্টো হতো

সৌমিত্র ঘোষ

আচ্ছা যদি উল্টো হতো ফল
ঘাসফুলেতে পদ্ম পড়তো ঢাকা
এই বাংলার মানচিত্র আজ
রক্ত দিয়ে আবার হতো আঁকা!!

কারোর মায়ের কোল হয়েছে খালি
ভাতের থালায় ছেলের ছিন্ন মাথা
পিশাচ দর্পে শাসকীয় সন্ত্রাস
অশ্রুশিক্ত দেখতো ভারতমাতা!!!

লাশের ওপরে হাঁটছে শহর গ্রাম
সাধের বাংলা নোনাজলে আছে ভিজে
স্তব্ধ কাঁসর ঘন্টা ঠাকুর ঘরে!
চুপ! ওই বাজে রাজপুত্রের ডিজে!!!

ডিজের তালে নাচছে ঘরে পিসি
যায়না কানে নিপীড়িতর শোক
গদির নেশায় মত্ত হীরকরানী
মুচকি হেসে ‘আর কটা দিন হোক!

নারকীয় নাচ শাসক আস্ফালনে
সুরার নেশায় পৈশাচিক আক্রোশ
ঘরে ঘরে যেন নিবিড় অন্ধকার
কারণ, ভিন্ন দলীয় হওয়াই দোষ!!!

কান চেপে ধরি, বুক করে ধড়ফড়
হৃদস্পন্দনে মৃত্যুর আহ্বান
জোড়াফুল দেয় বার্তা জিঘাংসার
ত্রাতার খোঁজেই ডুকরে কাঁদতো প্রাণ!

বোন কিংবা ঘরণী আজীবনের
বিলিয়ে দিতো ইজ্জত চিৎকারে
ছাড় কি পেতো সরল দুধের শিশু
প্রশ্ন থাকলো জনতার দরবারে?

আমি কোন দল, কোন পতাকার বাহক
জো-হুজুরের লাইনে থাকলে বেশ
অন্যথা হলে লেলিহান বিভীষিকা
পদদলিতয় জনতারা নিঃশেষ!!!

বদল চাই, যে কেউ চাইতে পারেই
বদল হওয়ায় পৃথিবী গতানুগতিক
কিন্তু সেখানে ক্ষমতার গুণিতকে
কেন খুন হবে মানবিক অনুভূতি!!!

দল আসে যায় দলদাসও যাবে থেকে
দেশকে তবুও স্তাবক উর্ধে রেখে
প্রজার সেবায় অশোকীয় থাকে যারা
ইতিহাসে রবে ত্রিবর্ণ রং মেখে...

তবুও অতীত বিষম অত্যাচারের
ভুলিয়ে, আজকে ক্ষমা বলে গেলো যারা—
সেই শহীদের ক্যানভাসে চেয়ে দেখো
জ্বলজ্বল করা কত মেঘে ঢাকা তারা!!

তোমাদের মতো আমরা হতাম যদি
ব্যতিক্রমীর সংজ্ঞা পড়তো ঢাকা
তার চেয়ে বরং মানবিকতার রঙে
জনতা দেখুক সোনার বাংলা আঁকা....

শ্রীরাম সমাজ সংস্কারক ও নারী দরদী

অশোক কুমার চ্যাটার্জী

মাত্র ১২ বছর বয়সে সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত করেন শ্রীরাম। গুরুদেব বশিষ্ঠমুনি তাঁকে পিতার বিশাল সাম্রাজ্য ঘুরে দেখার পরামর্শ দেন। মধুরভাষী, অত্যন্ত দয়ালু, প্রজাদের সেবায় তৎপর, নিরহংকার রাজকুমার শ্রীরাম শিকার করতে ভালবাসতেন না। তাঁর কোন কিছুর নেশা ছিল না, তবে উপযোগী ফুল-ফল এবং ঔষধির গাছ দূর-দূরান্ত হতে সংগ্রহ করে রাজ্যের সর্বত্র এবং প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। বলা হয়, শ্রীলঙ্কা থেকে 'আমের চারা' তিনিই প্রথম ভারতে এনেছিলেন। তাই তিনি প্রজাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শিশুকাল হতে সংসারে তাঁর বৈরাগ্য ছিল, গুরুদেব বশিষ্ঠমুনির উপদেশে প্রজাদের রক্ষার জন্যই তিনি সংসারী হয়েছিলেন। ভগবান বিশ্বামিত্র, যাঁর সঙ্গে গুরুদেব বশিষ্ঠমুনির প্রবল রেষারেষি, মাত্র ১৫ বছরের শ্রীরাম ও ভাই লক্ষণকে যজ্ঞ রক্ষার জন্য নিয়ে যান। ভগবান বিশ্বামিত্র ছিলেন রাজা 'কুশিক'-এর ছেলে 'কৌশিক'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, শ্রীরামের গুরুদেব বশিষ্ঠমুনির দেওয়া নাম 'বিশ্বামিত্র' নামেই তিনি বিখ্যাত হন। লক্ষ করুন, 'বিশ্ব+অমিত্র=বিশ্বামিত্র' অর্থাৎ 'যিনি বিশ্বের শত্রু'। ভাববার বিষয়।

ভগবান বিশ্বামিত্রই আমাদের গায়ত্রী মন্ত্র দিয়েছেন। তিনি প্রথমেই শ্রীরামকে তাড়কা রাক্ষসীকে বধের জন্য লাগালেন। শ্রীরাম বললেন, 'কিন্তু গুরুদেব তাড়কা নারী'। 'কিন্তু সে দুটি নগর ধ্বংস করে বহু লোককে সর্বস্বান্ত ও গৃহহারা করেছে, তার অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে'। ভগবান বিশ্বামিত্রের মুখে এই উত্তর শোনার পর, আর কোন প্রশ্ন না করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, শ্রীরাম তাড়কাকে বধ করলেন। এরপর দিন-রাত জেগে নিষ্ঠুর রাক্ষসদের বধ করে অন্যান্যদের পালাবার সুযোগ দিয়ে ধর্মাচরণের বাধা দূর করলেন।

এরপর ভগবান বিশ্বামিত্র, শ্রীরামকে দিয়ে 'অহল্যা' উদ্ধার করান। দেবরাজ ইন্দ্র ছলনায়, গৌতম মুনির পত্নী অহল্যার সতীত্ব হানি করেন। গৌতম মুনির তিরস্কার এবং অভিশাপে অহল্যা পাষানী হয়ে যান। শ্রীরামের চরণ স্পর্শে অহল্যা পুনরায় মানবী হয়ে যান। সকলে স্বীকার করেন যে, অহল্যা সম্পূর্ণ পবিত্র। গৌতম মুনিও তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় আগের মতোই ভালোবাসা আর সম্মান দিতে থাকেন। এমনকি ইন্দ্র ও অহল্যার পুত্র শতানন্দও গৌতম পুত্রের সম্মান পান, তিনি পরবর্তীকালে জনক রাজার পুরোহিতের পদ পেয়েছিলেন। এরপর গৌতম মুনিও শ্রীরামের প্রেরণায় পিতৃ পরিচয়হীন জবালার পুত্রকে সত্যকাম নাম দেন এবং বিদ্যা দান করেন। জাবালিও পরে মহাপণ্ডিত হন।

এরপর জনক রাজার পালিতা কন্যা সীতার স্বয়ম্বরে ভগবান বিশ্বামিত্র শ্রীরামকে নিয়ে যান। সেখানে আগত সমস্ত রাজকুমারদের মধ্যে একমাত্র শ্রীরামই গুণ চড়াতে গিয়ে হরধনু ভঙ্গ করতে সক্ষম হলে, সীতা শ্রীরামকেই বরমাল্য দেন। তখন অন্যান্য রাজারা শ্রীরামকে মায়াবী বলে যুদ্ধে অন্য আহ্বান করেন। ওই সুন্দর দিনে রাজাদের বধ করতে দয়ালু রামের একান্ত অনিচ্ছা ছিল। সেই মুহূর্তে হঠাৎ ঝড় ওঠে, সেই ঝড়ের মধ্যে থেকে 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' বলে গর্জন করতে করতে পরশুরাম প্রকট হন। যে রাজারা শ্রীরামকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছিলেন, তারাই তখন হাহাকার করতে করতে, হাতজোড় করে বললেন 'হে রাম আমাদেরকে দয়া করুন, আমাদের বধ করবেন না।' এই ঘটনা দেখে শ্রীরাম অবাক হলেন। প্রবল পরাক্রমশালী পরশুরাম পিতৃবধের প্রতিশোধ নিতে ২১ বার অত্যাচারী ক্ষত্রিয়দের সংহার করেছিলেন। মা কৌশল্যা এবং বাবা দশরথ ব্রাহ্মণ ভক্ত, তাই শ্রীরাম মধুর বচনে এবং পরশুরামেরই দেওয়া বৈষ্ণব ধনুতে গুণ দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করলেন। ভগবান পরশুরাম সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীরামকে আশীর্বাদ করে এবং বৈষ্ণব ধনু দিয়ে চলে গেলেন।

লক্ষ করুন, শ্রীরামচন্দ্র নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং এক বিবাহ প্রথা চালু করেন। শ্রীরাম এবং তাঁর ভাইয়েরা একপত্নী ব্রতী ছিলেন, এমনকি তাঁর প্রজারাও তাই, এটি কম কথা না। স্ত্রীদের যাতে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়, তাই শ্রীরাম ছোট পরিবারে বিশ্বাসী ছিলেন। শ্রীরামের সন্তান ছিল দুটি (জমজ পুত্র), তাঁর ভাইদেরও দুটি করে সন্তান এবং প্রজাদেরও তাই। এছাড়া তিনি সীতার

আধ্যাত্মিক যত্ন করতেন। বনপথে যেতে পায়ে কাঁটা ফুটলে একটি একটি করে তা বের করে দেওয়া, দুর্গম স্থানে কোলে নিয়ে যাওয়া, জল-ফুল-ফল সংগ্রহ করে এনে দেওয়া ইত্যাদি করতেন। সীতার প্রিয় ফল-মূলের বৃক্ষ দিয়ে পঞ্চবটী নামে বিখ্যাত বাগান তৈরি করে দেন শ্রীরাম। পঞ্চবটি হল—বট, কাঁঠাল, আমলকি, অশোক এবং বেল। এই পঞ্চবটি বাগান থেকে ফুল, ফল সকলেই সংগ্রহ করতেন, কোন অনুমতি লাগতো না।

লঙ্কার রাজকুমারী শূর্পনখা বিকেলে ফুল সংগ্রহ করতেন মাথায় গোজার জন্য। একদিন ফুল সংগ্রহ করার জন্য শূর্পনখা সীতার পঞ্চবটি বনে আসে, এতেই রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে শূর্পনখার দেখা হয়ে যায়। শূর্পনখা শ্রীরামকে প্রেম নিবেদন করেন, সীতার প্রতি ভালোবাসায় মোহিনী শূর্পনখার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন শ্রীরাম। এরপর লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করেও প্রত্যাখ্যাতা হলে, শূর্পনখা সীতাকে বধ করতে গেলে, লক্ষ্মণ তাঁকে নিবৃত্ত করে কঠোর তিরস্কার করেন। এটিই অলংকারিক নাক-কান কাটা। বাস্তবিক নাক-কান কাটা হয়নি, তার দুটি প্রমাণ আছে। প্রথম, লক্ষ্মণের অন্য স্ত্রীর মুখ না দেখার প্রতিজ্ঞা, আর মুখ না দেখে কারো নাক-কান কাটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রমাণ, তুলসীদাসের রামায়ণের উক্তি, শূর্পনখা নিজের মুখে ভাইয়ের কাছে ঘটনার বিবরণ শোনার পর বলেছেন, 'বধ লায়ক নাহি পুরুষ অনুপ' অর্থাৎ এই সুন্দর পুরুষ বধের যোগ্য নয়। বোনের নাক-কান কাটা গেল, সহজক্রোধী রাক্ষস কখনো একথা বলতেন না।

নারীদরদী শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীমতি মন্দোদরীর কথা ভেবে, রাবণকে সসম্মানে সীতাকে ফেরত দিয়ে, শান্তি স্থাপনের সুযোগ বারবার দিয়েছেন। এমনকি একদিন রাবণকে নিরস্ত্র এবং অসহায় পেয়েও বধ করেননি, তাকে ফিরে যেতে দিয়েছেন। আড়াল থেকে নয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে বালিকে বধ করেও, শ্রীরাম বালির স্ত্রী তারার কটুকথা এবং অভিশাপ হাসিমুখে স্বীকার করেছেন। রাবণের মৃত্যুর পর রানী মন্দোদরীর, বিভীষণের সঙ্গে এবং বালির মৃত্যুর পর তারার সঙ্গে সুগ্রীবের বিবাহ দিয়েছিলেন শ্রীরাম, তাঁদের ক্ষমতা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য। অন্যদিকে সীতা সম্পন্ন শুদ্ধ ও কলঙ্কমুক্ত জেনেও প্রজাদের সুখী করার জন্য তিনি সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন সত্য। কিন্তু তার সঙ্গে সব রাজভোগ তিনি নিজেও ত্যাগ করেছিলেন। যজ্ঞের জন্যও তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি, বরং স্বর্ণ সীতাকে পাশে রেখে যজ্ঞ সমাপ্ত করেছেন।

গুহক চন্ডালকে চোরাবালির কাছ থেকে বাঁচিয়ে শ্রীরাম তার প্রভু নয়, বন্ধু হয়েছিলেন। ভক্তিমতী বৃদ্ধা ব্যাধকন্যার দেওয়া এঁটো কুল তিনি খেয়েছিলেন। দুঃসময়েও তাঁর ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বে মদ্যপান, বৈধভাবে পশু-পাখি শিকার, জুয়া খেলা এবং নেশা করা বর্জিত ছিল। মাদক পাতার রস সেবনে জর্জরিত দেহ শম্বুক স্বর্গ (মৃত্যু) কামনা করতে থাকে এবং তার অনুসরণ করে, ব্রাহ্মণ বালক মৃত প্রায় হয়।

ঘটনার বিবরণ জেনে, শ্রীরামচন্দ্র বালককে চিকিৎসকদের দ্বারা সুস্থ করেন এবং দুঃখিত মনে শম্বুককে মুক্তি দেন। শম্বুককে ভালো করতে না পারায়, তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করেন। এরপর শম্বুকও স্বর্গে গমন করে, দেবতারা শ্রীরামকে নির্দোষ জ্ঞানে পুষ্পবৃষ্টি করেন। তাই শ্রীরামচন্দ্রকে অনুসরণ করে সবার জন্য এক আইন এবং স্ত্রী পুরুষ সমান অধিকার যুগের দাবি ওঠে। ■

যজ্ঞ ও গীতাপাঠ, মাধবপুর, মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

হুগলি জেলার সিঙ্গুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বৈঠক, মধ্যবঙ্গ

পঞ্চবট

রাজকুমারী মাহেশ্বরী

এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ গাছ থাকলেও ভারতবর্ষে কিছু গাছ হাজার হাজার বছর ধরে টিঁকে আছে, এবং যার মধ্যে কিছু গাছ অলৌকিক। এমন কিছু গাছও আছে যা হাজার হাজার বছর আগে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রোপণ করেছিলেন, অথবা সেই ব্যক্তি সেই গাছের নিচে ধ্যান করেছিলেন বা সমাধি লাভ করেছিলেন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে, পাঁচটি বটগাছের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বলা হয় প্রয়াগের অক্ষয়বট, নাসিকের পঞ্চবট, বৃন্দাবনের এবং মথুরার ভাণ্ডীবীরনের বংশীবট গয়ার গয়াবট এবং উজ্জয়িনীর সিদ্ধাবটের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক ভাবে কেউ কিছু জানেন না। এই পঞ্চবট গাছকে সনাতনীরা বিশ্বের পবিত্র বৃক্ষ হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

১. অক্ষয়বট (প্রয়াগরাজ) : অক্ষয়বট সম্পর্কে পুরাণে বর্ণনা আছে যে কল্পান্তে বা প্রলয় শেষে যখন সমগ্র পৃথিবী জলে নিমজ্জিত হয়, তখন একটি বটবৃক্ষ বেঁচে থাকে। অক্ষয়বট নামক এই গাছের একটি পাতায় ভগবান শিশুরূপে বিরাজ করেন, সৃষ্টির চিরন্তন রহস্য পর্যবেক্ষণ করেন।

এই অক্ষয়বটের উল্লেখ পাওয়া যায় কালিদাসের রঘুবংশে এবং চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণকাহিনীতে। বলা হয়, অক্ষয়বট গাছটি এখনও প্রয়াগের ত্রিবেণী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুদের পাশাপাশি জৈন এবং বৌদ্ধরাও এটিকে পবিত্র বলে মনে করেন। কথিত আছে যে, বুদ্ধ কৈলাস পর্বতের কাছে প্রয়াগের অক্ষয়বট গাছের একটি বীজ রোপণ করেছিলেন। জৈনরা বিশ্বাস করেন যে তাঁদের তীর্থঙ্কর ঋষভদেব এই অক্ষয়বট গাছের নিচে ধ্যান করেছিলেন।

প্রয়াগের এই স্থানটি ঋষভদেব তপস্থলী (বা তপোবন) নামে পরিচিত। বারাণসী এবং গয়াতেও একই রকম বটগাছ রয়েছে যেগুলোকে অক্ষয়বট গাছ হিসাবে পূজা করা হয়। কুরুক্ষেত্রের কাছে জ্যোতিসর নামক স্থানে একটি বটগাছ আছে, যা সম্পর্কে বিশ্বাস করা হয় যে এটি অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণের গীতা জ্ঞানে সাক্ষী।

অক্ষয়বট অমর... যেমন এর নাম থেকেই বোঝা যায়, অক্ষয়। অক্ষয় মানে 'যা কখনও ক্ষয় হয় না, যা কখনও ধ্বংস হতে পারে না।' তাই এই গাছটিকে অক্ষয়বট বলা হয়। বট মানে 'বটগাছ', 'গাছ', ইত্যাদি। এই গাছটিকে 'মনোরথ বৃক্ষ'ও বলা হয়, যার অর্থ 'মোক্ষদাতা' বা 'ইচ্ছাপূরণকারী'। এই গাছটি হাজার হাজার বছর ধরে প্রয়াগের সঙ্গম নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে।

গাছটির বয়স ৫২৭৬ বছর।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা অনুসারে, এই গাছটির রাসায়নিক বয়স আনুমানিক ৩২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, অর্থাৎ ৩২৫০ + ২০২৬ = ৫২৭৬ বছর। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে, সঙ্গমের কাছের দুর্গে অক্ষয় বট-এর একটি শাখা প্রদর্শন করা হয়। পুরো গাছটি কখনও দেখানো হয় না। সপ্তাহে দুদিন, দেখার জন্য দরজা খোলা হয়।

৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাং যখন প্রয়াগ ভ্রমণ করেন, তখন তিনি লিখেছিলেন, ''এই শহরে একটি মন্দির আছে, যা তার অলঙ্করণ এবং অসাধারণ অলৌকিক ঘটনার জন্য বিখ্যাত। বলা হয় যে এখানে একটি পয়সা দান করা অন্যান্য তীর্থস্থানে হাজারটি স্বর্ণমুদ্রা দান করার সমান, এবং যদি কেউ এখানে প্রাণত্যাগ করে, তবে সে অনন্ত স্বর্গ লাভ করে।'' মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বিশাল গাছ দাঁড়িয়ে আছে, যার শাখা-প্রশাখা ও পাতা এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এর ঘন ছায়ার নিচে, ডানে ও বামে, স্বর্গের আকাঙ্ক্ষায় গাছ থেকে পড়ে প্রাণীদের হাড়ের স্তূপ পড়ে আছে।

গাছটিকে ধ্বংস করার জন্য বহুবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠান রাজারা এবং তাদের পূর্বপুরুষরাও ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। জাহাঙ্গীরও একই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গাছটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে নতুন শাখা-প্রশাখা গজিয়েছিল। ১৬৯৩ সালে প্রকাশিত 'খুলাসত উত্তরিখ'-এ উল্লেখ আছে যে, জাহাঙ্গীরের আদেশে এই অক্ষয়বট গাছটি কেটে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু এটি আবার বেড়ে উঠেছিল। আওরঙ্গজেবও গাছটিকে ধ্বংস করার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এটিকে খনন করিয়েছিলেন, পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং এমনকি এর শিকড়ে অ্যাসিডও ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু, এই পুণ্যময় অক্ষয়বট বৃক্ষটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।

আওরঙ্গজেবের পোড়ানোর চিহ্ন আজও দেখা যায়। এই গাছের শিকড় এত গভীরে চলে গেছে যে তা বোঝা কঠিন।

ধর্মীয় তাৎপর্য : দ্বাদশ মাধবের মতে, বালমুকুন্দ মাধব এই অক্ষয়বটে বাস করেন। এটি সেই স্থান যেখানে মাতা সীতা গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং জৈনধর্মের পদ্মাচার্যের ভক্তি তপস্যা পূর্ণ হয়েছিল। পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য, ভগবান ব্রহ্মা এখানে একটি মহাযজ্ঞ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং পুরোহিত, ভগবান বিষ্ণু আয়োজক এবং ভগবান শিব দেবতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে, তাঁদের সম্মিলিত শক্তিতে, এই তিন দেবতা পৃথিবীর পাপের বোঝা হালকা করার জন্য একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। এটি ছিল একটি বটবৃক্ষ, যা আজ অক্ষয়বট নামে পরিচিত। এটি আজও বিদ্যমান।

শ্রীরাম সম্পর্কিত একটি কাহিনী

প্রয়াগের দক্ষিণ তীরে ঝুনসি নামে একটি স্থান রয়েছে, যার প্রাচীন নাম ছিল পুরুরব। কালক্রমে এর নাম হয় উল্টা প্রদেশ। তারপর ধীরে ধীরে এটি ঝুনসি নামে পরিচিত হয়। এই নামকরণের কারণ হল, এক অভিশাপের ফলে এখানকার সবকিছু উল্টো ছিল। এখানকার প্রাসাদের ছাদ নিচের দিকে তৈরি, যা আজও বিদ্যমান। এর জানালাগুলো উপরে এবং আকাশ-আলোর পথগুলো নিচে তৈরি। অর্থাৎ, সবকিছুই উল্টো। কিংবদন্তি অনুসারে, উল্টা প্রদেশ নামটি হওয়ার কারণ হল, ভগবান শিব এখানে তাঁর স্ত্রী পার্বতীর সঙ্গে নির্জনে বাস করতেন এবং একটি অভিশাপ ছিল যে, যে কেউ এই বনে প্রবেশ করবে সে নারীতে রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ, যে যা থাকবে ঠিক তার উল্টোটা ঘটবে।

ত্রেতা যুগে, যখন শ্রীরাম তাঁর মা কৈকেয়ীর নির্দেশে নির্বাসিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর গোত্রপতি, ভগবান সূর্য, গভীরভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। তিনি বনবাসকালে তাঁর দুর্ভোগে সাহায্য করার জন্য হনুমানকে আদেশ দিলেন, কারণ হনুমান ভগবান সূর্যের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাই, গুরুর আদেশ পালন করে তিনি (হনুমান) প্রয়াগের সঙ্গম নদীর তীরে এসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কারণ হনুমান ব্রহ্মচারী ছিলেন তাই তিনি কোন নারীকে পার হতে পারতেন না। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী—এই তিনটিই ছিল নদী। তাই, সেগুলো পার না হয়ে তিনি সঙ্গমের পবিত্র তীরে ভগবান রামের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ভগবান রাম যখন অযোধ্যা ত্যাগ করেন, তখন তাঁকে ঝুনসি বা উল্টো প্রদেশের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো, কিন্তু প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, শিবের অভিশাপের কারণে তাঁকে নারী রূপে রূপান্তরিত হতে হতো। তাই, তিনি তাঁর পথ পরিবর্তন করেন। আরও একটি কারণে ভগবান রামকে তাঁর পথ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। যদি তিনি সরাসরি গঙ্গা পার হতেন, তাহলে হনুমান ওঁনাকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে দিকে উড়ে যেতেন কিন্তু শরবীর উদ্ধার এবং খর এবং দূষণের সংহার হতো না। এই কথা মনে রেখে ভগবান রাম তাঁর পথ পরিবর্তন করলেন এবং শৃঙ্গবেরপুর থেকে গঙ্গা পার হলেন। যেহেতু ভগবান রামের উপর এই শর্ত ছিল যে তিনি তাঁর বনবাসকালে কোন গ্রামে প্রবেশ করবেন না, তাই তিনি সেই শর্তটিও পূরণ করেছিলেন।

প্রয়াগে ধ্যানরত মহর্ষি ভরদ্বাজ এই বিষয়ে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। ভগবান রামকে স্বাগত জানানোর আগেই তিনি শৃঙ্গবেরপুরে পৌঁছালেন। ভগবান রাম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘হে মহর্ষি! আমি রাতে কোথায় বিশ্রাম নেব?’’ ঋষি ব্যাখ্যা করলেন যে সেখানে একটি বটগাছ আছে। ‘‘আমাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে সে আমাদের তার ছায়ায় থাকতে দেবে কি না। কারণ হল, তোমার মা কৈকেয়ীর ভয়ে কেউ তোমাকে সেখানে থাকতে দেবে না। সবাই ভয় পায় যে যদি কেউ তোমাকে সেখানে থাকতে দেয় এবং কৈকেয়ী তা জানতে পারেন, তবে তিনি রাজা দশরথকে তাঁদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বলবেন।’’ এইভাবে, ভগবান রামকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি ভরদ্বাজ বটগাছটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভগবান রাম জিজ্ঞাসা করলেন যে গাছটি তাঁকে তার ছায়ায় রাত কাটাতে দেবে কি না। বটগাছটি উত্তর দিল, ‘‘কে জানে দিনরাত কত লোক আমার ছায়ায় এসে বিশ্রাম নেয়, অথচ কেউ আমার কাছে অনুমতি চায় না। তুমি আমার কাছে অনুমতি চাইছ কেন?’’ ঋষি পুরো ঘটনাটি ব্যাখ্যা করলেন। বটগাছটি বলল, ‘‘হে মহাত্মা! যদি কারও দুঃখে সাহায্য করা পাপ হয়, যদি কারও দুঃখে অংশীদার হওয়া এবং তার কষ্ট লাঘব করা অপরাধ হয়, তবে আমি এই পাপ ও অপরাধ করতে প্রস্তুত। আপনি কোন চিন্তা ছাড়াই এখানে বিশ্রাম নিতে পারেন এবং যতক্ষণ ইচ্ছা থাকতে পারেন।’’

এই কথা শুনে ভগবান রাম বললেন, ‘‘হে বটবৃক্ষ!

এমন চিন্তা মানুষ বা দেবতার মধ্যেও খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তুমি বৃক্ষ হয়েও যদি এমন মহৎ চিন্তা পোষণ করো, তবে আজ থেকে তোমার আর বটবৃক্ষ না হয়ে অক্ষয়বট হওয়া উচিত। যে তোমার ছায়ায় এক মুহূর্তও কাটাবে, সে শাশ্বত পুণ্যফল লাভ করবে। সেই থেকে এই বৃক্ষটি পুরাণ ও জগতে অক্ষয়বট (অমর বৃক্ষ) নামে বিখ্যাত হয়েছে এবং আজও এটি সঙ্গমের সবচেয়ে পবিত্র তীরে অবস্থিত।”

২. পঞ্চবটি (নাসিক) : পঞ্চবটি মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলায় গোদাবরী নদীর কাছে অবস্থিত একটি বিখ্যাত পৌরাণিক স্থান। বিশ্বাস করা হয় যে, এখানেই লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাক কেটেছিলেন তাই এই অঞ্চলের নাম নাসিক রাখা হয়।

ভগবান রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার সঙ্গে তাঁদের বনবাসকালে বেশ কিছুদিন এখানে বাস করেছিলেন এবং এখান থেকেই লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলেন। পঞ্চবটি নাসিকের উত্তর অংশে অবস্থিত। ঐতিহাসিক ঘটনার কারণেই পঞ্চবটি বিখ্যাত।

বর্তমানে, পঞ্চবটিতে পাঁচটি বটগাছের কাছে সীতা গুহা অবস্থিত, যেখান থেকে সীতাকে অপহরণ করা হয়েছিল। এটি নাসিকের আরেকটি প্রধান আকর্ষণ। এই গুহায় প্রবেশ করার জন্য একটি সরু সিঁড়ি বেয়ে যেতে হয়।

পুরাণে বর্ণিত পঞ্চবটি। প্রাচীন গ্রন্থ ‘স্কন্দ পুরাণ’-এর হেমাদ্রি ব্রত অংশ অনুসারে, পঞ্চবটির বর্ণনা নিম্নরূপ : ‘‘অশ্বত্থ, বেল, বট, ধাত্রী এবং অশোক—এই পাঁচটি বৃক্ষকে পঞ্চবটি বলা হয়। এগুলোকে পাঁচটি দিকে রোপণ করা উচিত। তপস্যার জন্য অশ্বত্থ (অশ্বত্থ) পূর্ব দিকে, বেল এবং অশোক উত্তর দিকে, বট পশ্চিম দিকে এবং ধাত্রী (আমলা) দক্ষিণ দিকে রোপণ করা উচিত। পাঁচ বছর পর, কেন্দ্রে চার পায়ের একটি সুন্দর ও মনোরম বেদি স্থাপন করা উচিত। এটি শাশ্বত ফল প্রদান করে এবং তপস্যার ফল জোগায়।”

৩. বংশীবট (বৃন্দাবন, মথুরা) : বংশীবট ব্রজমণ্ডলের বারোটি বনের অন্যতম ভাণ্ডিরবনে অবস্থিত। এটি ভগবান কৃষ্ণের রাসলীলার স্থান। তহসিল মান্টের মঠের সদর দপ্তর থেকে এক কিলোমিটার দূরে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত এই স্থানটিতেই ভগবান কৃষ্ণ প্রতিদিন গরু চরাতেন। বংশীবট সেই স্থান, যার কথা ভগবান কৃষ্ণ দ্বাপর যুগে তাঁর মাতা যশোদাকে বলেছিলেন। এখানেই রাসবিহারী বিভিন্ন দিব্য লীলা সম্পাদন করেছিলেন। বেনুবাদন, দাবানল, কাপান এবং প্রকাম্বাসুর প্রভৃতিদের বধ করেন এবং নিত্যদিনের রাসলীলার সাক্ষী এই বটগাছের নাম বংশীবট রাখা হয়েছিল, কারণ কৃষ্ণ এর ডালে বসে বাঁশি বাজিয়ে গোপীদের মন জয় করতেন। কখনো কখনো মনোরম রাতে, কৃষ্ণ এখান থেকে তাঁর প্রিয় গোপীদের নাম ধরে ডাকতেন, ‘‘রাধিকে! ললিতে! বিশাখা!” এই সখীরা এলে এই বংশীবট গাছের নিচেই রাসলীলা অনুষ্ঠিত হত।

গোচারণের সময় কৃষ্ণ এই গাছের নিচেই রাধা ও তাঁর সখীদের সঙ্গে রাসলীলা করতেন। ব্রজ মণ্ডলের ভাণ্ডিরবনে ভাণ্ডিরবট থেকে অল্প দূরে বংশীবট অবস্থিত। এই বংশীবট বৃন্দাবনের বংশীবট থেকে আলাদা। ভগবান কৃষ্ণ যখন এখানে গরু চরাতেন, তখন তিনি এই বটগাছটিতেই চড়তেন, বাঁশি দিয়ে গরুদের নাম ধরে ডাকতেন, তাদের জড়ো করতেন এবং সবগুলোকে একসাথে তাঁর পালের কাছে নিয়ে যেতেন।

আজও, বংশীবট নামক এই বটগাছটি থেকে কান পাতলে ঢাকের ধ্বনি আর রাধে-রাধে সুর শোনা যায়। এর ছায়ায় বসে স্তোত্রগান করলে মন ভরে যায়। শত শত ঋষি এই স্থানেই তপস্যায় মগ্ন থাকেন।

৪. গয়াবট (গয়া) : উজ্জয়িনীর সিদ্ধ বট-এর পর, গয়ার গয়া বট-এর কাছে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করা হয়। শ্রাদ্ধ, তর্পণ এবং পিণ্ডদানের শহর গয়ায়, গয়াবৃক্ষ নামে একটি অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিশাল বটগাছ রয়েছে। গয়াসুর নামক এক অসুরের নামে গয়ার নামকরণ করা হয়েছিল। বর্তমানে, এই গাছটি বোধিবৃক্ষ নামে পরিচিত। বোধগয়া যাওয়ার প্রধান সড়কের উপর মাড়নপুর থেকে অল্প দূরে, সীমানা প্রাচীর দ্বারা ঘেরা একটি প্রশস্ত বাঁধানো চত্বরের মাঝখানে এই বটগাছটি দাঁড়িয়ে আছে।

বিশ্বাস করা হয় যে, ভগবান ব্রহ্মা স্বর্গ থেকে গয়া বৃক্ষটি এনে রোপণ করেছিলেন। গয়ার এই স্থানটি একটি প্রধান তীর্থস্থান সেখানে চূড়ান্ত পিণ্ডদান করা হয়। কেউ কেউ একে অক্ষয়বট বলেন কারণ এটিও শাশ্বত। বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং তার সুবিশাল শিকড়সহ এই গয়াববৃক্ষের প্রথম দর্শনেই এর প্রাচীনত্ব সহজেই প্রকাশ পায়। শ্রীবিষ্ণুপদ মন্দির এবং ব্রহ্মযোনি পর্বতের

সমান্তরালে অবস্থিত মগধের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী স্থান গয়াবট, যা আদি শক্তিপীঠ মহামায়া মঙ্গলা গৌরীর দিকে অবস্থিত, সেখানে রয়েছে বৃদ্ধ প্রপিতা মহেশ্বর মন্দির, রুক্মিণী পুকুর, গাদলোল দধিকুল্য এবং মধুকুল্য তীর্থ বেদী।

গয়াবটের কাহিনি : লোককথা অনুসারে, ত্রেতা যুগে ভগবান রাম, তাঁর ভাই লক্ষ্মণ এবং স্ত্রী সীতাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের পিতা দশরথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করার জন্য গয়ায় এসেছিলেন। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় ভগবান রাম এবং লক্ষ্মণ কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে যান। রাজা দশরথ সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁর পুত্রদের অনুপস্থিতিতে সীতাকে পিণ্ডদান করার নির্দেশ দেন। ফাল্গু নদী, একটি গাভী, একটি বটগাছ এবং একটি কেতকী ফুলকে সাক্ষী রেখে সীতা পিণ্ডদান সম্পন্ন করেছিলেন। পরে, ভগবান রাম ফিরে এলে তাঁকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলা হলে তিনি তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তখন সীতা পিণ্ডদানের সকল সাক্ষীকে এগিয়ে এসে সত্য বলার জন্য বললেন। পিণ্ডদানকারী পুরোহিত, ফাল্গু নদী, গাভী এবং কেতকী ফুল সকলেই মিথ্যা বলেছিল, কিন্তু বটগাছটি সত্য বলে সীতার সম্মান রক্ষা করেছিল। ফলস্বরূপ, সীতা ফাল্গু নদীকে জলহীন হওয়ার এবং কেতকী ফুলকে শুভ কাজে ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিশাপ দেন, কিন্তু বটগাছকে অমরত্বের আশীর্বাদ করেন।

গয়া তীর্থের শ্রাদ্ধের প্রধান আচার-অনুষ্ঠান তিনটি প্রধান কাজ নিয়ে গঠিত : পিণ্ডদান, তর্পণ এবং ব্রাহ্মণ ভোজ। দক্ষিণ দিকে মুখ করে, আচমন করে, ডান কাঁধে পৈতা ধারণ করে এবং ভক্তিভরে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে চাল, গরুর দুধ, ঘি, চিনি ও মধু দিয়ে তৈরি পিণ্ড নিবেদন করাকে পিণ্ডদান বলা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এতে পূর্বপুরুষরা সন্তুষ্ট হন। শাস্ত্রে পূর্বপুরুষদের অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয় যে তাঁরা চন্দ্রের থেকেও দূরে এবং দেবতাদের থেকেও উচ্চতর স্থানে বাস করেন।

বলা হয় যে গয়ায় বিভিন্ন নামে ৩৬০টি বেদি ছিল যেখানে পিণ্ডদান করা হতো। এর মধ্যে মাত্র ৪৮টি অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুপদ মন্দির, ফাল্গু নদীর তীর এবং অক্ষয়বটে পিণ্ডদান করা আবশ্যক বলে মনে করা হয়। এই কারণেই দেশে ৫৫টি স্থান শ্রাদ্ধ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত করা হয়, তার মধ্যে বিহারের গয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।

গয়াবট, যা বৌধবট নামেও পরিচিত, গয়া থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি বৌদ্ধ তীর্থস্থান। এখানেই, বোধিবৃক্ষের নিচে, ভগবান বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

৫. সিদ্ধবট (উজ্জয়িনী) : উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ভৈরবগড়ের পূর্বে, শিপ্রা নদীর মনোরম তীরে অবস্থিত এই প্রাচীন সিদ্ধবট। এটি শক্তিভেদ তীর্থ নামে পরিচিত। হিন্দু পুরাণগুলোতে এই স্থানের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে, উজ্জয়িনীর এই পবিত্র সিদ্ধবট বৃক্ষটি দেবী পার্বতী রোপণ করেছিলেন এবং শিবের একটি রূপ হিসেবে এর পূজা করতেন।

এখানে নাগবলী ও নারায়ণ বলি যজ্ঞের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ধনসম্পদ, সন্তান ও মোক্ষ লাভের জন্য এখানে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। দেবী পার্বতী কর্তৃক রোপিত এই বটগাছটিকে শিবের একটি রূপ হিসেবে পূজা করা হয়। শিবকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য দেবী পার্বতী এখানে এই গাছটি রোপণ করে তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান শিব আবির্ভূত হন এবং শুধু দেবী পার্বতীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণই করেননি, বরং তাঁকে এই বরও দেন যে, যে কেউ এই বটগাছকে দুধ নিবেদন করবে, সে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে এবং তার পূর্বপুরুষদের মোক্ষ লাভ হবে।

কথিত আছে যে, পার্বতীর পুত্র কার্তিক স্বামী তারকাসুরকে বধ করার জন্য এই বটগাছটির নিচেই কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে দেবতাদের সেনাপতি নিযুক্ত হন। পরে, ভগবান শিব এই বটগাছটিকে সিদ্ধাবট (পবিত্র বৃক্ষ) হিসেবে ঘোষণা করেন এবং এটিকে যুগ যুগ ধরে চিরস্থায়ী থাকার বর দেন।

এখানে তিন প্রকার সিদ্ধি লাভ হয় : সন্তান, ধনসম্পদ এবং মোক্ষ। এই তিনটিই লাভের জন্য পূজা করা হয়। পূর্বপুরুষদের মোক্ষের জন্য একটি বিশেষ পূজা-অর্চনা করা হয়। ধনসম্পদের জন্য, অর্থাৎ লক্ষ্মীর জন্য, গাছটির চারপাশে একটি রক্ষাকবচ বাঁধা হয় এবং বংশধরের জন্য, অর্থাৎ পুত্রের জন্য, একটি উল্টো স্বস্তিকা আঁকা হয়। এই গাছটি তিন প্রকার সিদ্ধিই প্রদান করে, এই কারণেই একে সিদ্ধাবত বলা হয়।

স্কন্দ পুরাণে একে কল্পবৃক্ষও বলা হয়েছে। এটিকে

পৈতৃক মোক্ষের জন্য একটি তীর্থস্থান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কালসর্প শান্তির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, এই কারণেই কালসর্প দোষেরও পূজা করা হয়। বর্তমানে, এই সিদ্ধাবট স্থানটি বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, মোক্ষ কর্ম, পিণ্ডদান, কালসর্প দোষ পূজা এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একটি প্রধান স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। বলা হয় যে, মুঘল সম্রাটরা এর ধর্মীয় তাৎপর্য জেনে বটগাছটির গোড়ায় কুঠার চালিয়ে সেটিকে ধ্বংস করে দেন এবং তারপর মোটা লোহার পাত ও কড়াই দিয়ে তা বেঁধে দেন। বলা হয় যে, সেখান থেকে নতুন চারা গজিয়েছিল এবং গাছটি আজও সতেজ ও প্রাণবন্ত রয়েছে। মন্দিরটি বাঁধানো মেঝে দিয়ে ঘেরা। বাস্তবে এই সমস্ত (৫টি) বটগাছকে পঞ্চবট বলে সনাতনীরা এবং তাঁদের জীবনে প্রমুখ স্থান দিয়ে রেখেছেন। তাই এঁর বৃহৎ ইতিহাস জানার প্রয়োজন আছে। ■

পরিষদ বার্তা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত দশ দিবসীয় প্রশিক্ষণ বর্গ

মালদহ জেলার ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে ১ জুন থেকে দশ দিনের কার্যকর্তা প্রশিক্ষণ বর্গ ১০ জুন বুধবার পর্যন্ত সুসম্পন্ন হলো। ১০ জুন বৈকালে তিনটা থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল সমারোহ উৎসব। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি কেশব গৌড়ীয় মঠের স্বামীজী স্বজন মহারাজ, ঘাকশোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মঠাধ্যক্ষ স্বামী বৈবস্বতানন্দজী মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিনী সদস্য মাননীয় অদ্বৈত চরণ দত্ত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্রের সংগঠন মন্ত্রীঅমিয় কুমার সরকার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি শ্রীনারায়ণচন্দ্র মণ্ডল, এই বর্গের বর্গাধিকারী হিসেবে ছিলেন শ্রীনিখিলচন্দ্র মজুমদার। এছাড়া ও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ব ক্ষেত্রের সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার, সংঘের উত্তর বঙ্গ সহ প্রান্ত প্রচারক শ্রীসিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, বিভাগ প্রচারক শ্রীঅধিন সিংহ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ সভাপ্রতি তপন দাস, বিদ্রোহী সরকার, ধর্ম প্রসার বিভাগের মন্টু সরকার। সর্বব্যবস্থা প্রমুখ ছিলেন মালদহ জেলার সম্পাদক শ্রীতাপস সুকুল, গাজোলের সভাপতি শ্রীমানবেন্দ্র সরকার। সর্বক্ষণ ছিলেন প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী শ্রীঅনুপ কুমার মণ্ডল, এছাড়া ও ছিলেন বুবাই নস্কর, লক্ষ্মণ বনসাল, গোপাল কুণ্ডু, প্রদীপ থাপা, রাকেশ আগ্রয়াল, মালদহ বিভাগ সঙ্ঘচালক পিযুষ কান্তি সাহা, দীপঙ্কর কমল বর্মা। অনুষ্ঠানে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের শারীরিক প্রদর্শন হয়। প্রথমে পুরুষদের পরে মহিলাদের প্রদর্শন হয়। তারপর আশীর্বচন দান করেন স্বামী বৈবস্বতানন্দজী মহারাজ, ভাষণ দেন স্বামী স্বজন মহারাজ, মূল বক্তব্য রাখেন শ্রীঅদ্বৈত চরণ দত্ত এবং অমিয় কুমার সরকার ও নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল, বর্গের প্রতিবেদন পাঠ করেন বর্গাধিকারী নিখিল চন্দ্র মজুমদার, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত থেকে ১১ জেলা, ৪৮ প্রখণ্ড, ১১১ গ্রাম থেকে ১৮০ জন শিক্ষার্থী এই বর্গে অংশগ্রহণ করে। এইবর্গে প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থা বিভাগের সব মিলিয়ে ২৩০ জন ছিলেন। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সোমা চক্রবর্ত্তী। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গাজোলের সম্পাদক শ্রী অনুপম গোস্বামী। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মানবেন্দ্র সরকার।

জলছত্র, বেহালা, কলকাতা

দুর্গা মাতৃ বৈঠক, সুন্দরবন জেলা

बंगाल 2026 : क्या इतिहास पुनः अपनी दिशा बदल रहा है?

सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्रचेतना का पुनर्जागरण

प्रशांत सिंघानिया

इतिहास केवल तिथियों, युद्धों, चुनावों और शासन-परिवर्तनों का क्रम नहीं है। जो परिवर्तन किसी दिन हमारी आँखों के सामने घटित होते हैं, वे प्रायः उस दीर्घ प्रक्रिया का अंतिम दृश्य होते हैं, जिसकी शुरुआत समाज की चेतना में बहुत पहले हो चुकी होती है। किसी विशाल वृक्ष की तरह इतिहास भी पहले अपनी जड़ें भीतर फैलाता है और उसके बाद ही बाहर दिखाई देता है।

भारतीय दृष्टि इतिहास को तीन स्तरों पर समझती है—दृश्य इतिहास, मानसिक इतिहास और आध्यात्मिक इतिहास। दृश्य इतिहास वह है जिसे अभिलेख, समाचार और घटनाएँ दर्ज करती हैं। मानसिक इतिहास समाज की सामूहिक आकांक्षाओं, आशाओं और संकल्पों का इतिहास है। आध्यात्मिक इतिहास उससे भी गहरा है; वह किसी सभ्यता के नैतिक बल, आत्मविश्वास, सांस्कृतिक स्मृति और धर्मबोध का इतिहास है। जब यही आधार सुदृढ़ होता है, तब परिवर्तन केवल शासन में नहीं, समाज की आत्मा में भी दिखाई देता है।

इसी व्यापक दृष्टि से यदि पश्चिम बंगाल के 2026 के जनादेश को देखा जाए, तो वह केवल एक चुनाव परिणाम नहीं रह जाता। उसे उस दीर्घ सामाजिक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है, जिसमें एक समाज अपनी दिशा, अपनी पहचान और अपने भविष्य पर पुनर्विचार करता है। इस लेख का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि उस व्यापक सभ्यतागत प्रश्न की पड़ताल करना है कि क्या बंगाल पुनः अपनी ऐतिहासिक भूमिका की ओर लौट रहा है।

बंगाल : भारत की सभ्यतागत चेतना का केन्द्र

भारतीय इतिहास में कुछ प्रदेश ऐसे रहे हैं जिन्होंने केवल अपने भूगोल को नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र की चेतना को प्रभावित किया है। बंगाल उनमें अग्रणी रहा है। यहीं श्रीचैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को सामाजिक समरसता का आधार बनाया। राजा राममोहन राय ने सामाजिक सुधार का नया अध्याय प्रारम्भ किया। बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने वन्दे मातरम् के माध्यम से राष्ट्र को मातृशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। श्रीरामकृष्ण परमहंस ने

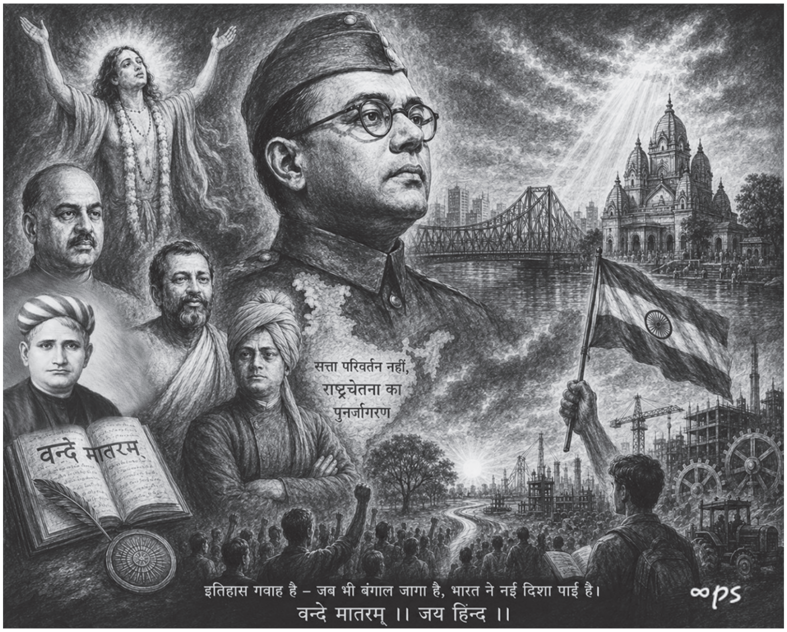

आध्यात्मिक समन्वय का संदेश दिया, जबकि स्वामी विवेकानन्द ने आत्मविश्वास खो चुके भारत को उसकी अंतर्निहित शक्ति का बोध कराया। श्रीअरविन्द ने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक साधना का आयाम दिया और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रश्न माना।

इस प्रकार बंगाल केवल एक राज्य नहीं, बल्कि

आधुनिक भारत के वैचारिक और सांस्कृतिक निर्माण की प्रमुख भूमि रहा है। यहाँ से उठे विचारों ने शिक्षा, साहित्य, आध्यात्मिकता, राष्ट्रवाद और सामाजिक परिवर्तन की दिशा निर्धारित की। इसलिए बंगाल में होने वाला कोई भी बड़ा परिवर्तन प्रायः राष्ट्रीय महत्व का विषय बन जाता है। इतिहास यह भी बताता है कि जब बंगाल जागा, तब भारत ने नई दिशा पाई; और जब बंगाल संकट में पड़ा, तब उसका प्रभाव भी पूरे राष्ट्र ने अनुभव किया। यही कारण है कि आज यदि बंगाल में परिवर्तन की नई चर्चा हो रही है, तो उसका मूल्यांकन केवल चुनावी परिणामों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यापक सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में किया जाना चाहिए।

उत्थान से अवनति तक : एक ऐतिहासिक यात्रा

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पश्चिम बंगाल भारत के सबसे विकसित और प्रभावशाली राज्यों में था। कोलकाता उद्योग, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति का प्रमुख केन्द्र था। विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक थी और बंगाल की बौद्धिक परम्परा पूरे देश को दिशा देती थी। किन्तु पिछले पाँच दशकों में यह स्थिति धीरे-धीरे बदलती गई। उद्योगों का पलायन, निवेश में कमी, राजनीतिक हिंसा, प्रशासनिक चुनौतियाँ और प्रतिभाशाली युवाओं का अन्य राज्यों की ओर जाना—इन सबने मिलकर बंगाल की विकास-यात्रा को प्रभावित किया। यह परिवर्तन किसी एक सरकार, दल या नेता का परिणाम नहीं था; इसके पीछे दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे।

किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था नहीं होती, बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। जब समाज अपने भविष्य पर विश्वास खोने लगता है, तब आर्थिक और संस्थागत चुनौतियाँ भी गहरी हो जाती हैं। बंगाल ने इस कठिन दौर का अनुभव किया, किन्तु उसकी सांस्कृतिक चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। साहित्य, कला, आध्यात्मिक परम्परा और राष्ट्रचिंतन की धारा निरंतर प्रवाहित होती रही। इसी अवधि में समाज की चेतना पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। साहित्य, कला, आध्यात्मिक परम्परा और राष्ट्रचिंतन की धारा निरंतर प्रवाहित होती रही। इसी अवधि में समाज के भीतर एक प्रश्न भी धीरे-धीरे उभरने लगा—क्या बंगाल पुनः अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है? क्या वह शिक्षा, उद्योग, संस्कृति और राष्ट्रीय नेतृत्व के क्षेत्र में फिर से अग्रणी बन सकता है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर किसी एक चुनाव से नहीं मिलता, किन्तु कभी-कभी कोई जनादेश यह संकेत अवश्य देता है कि समाज की मनःस्थिति बदल रही है।

यदि 2026 का जनादेश उसी परिवर्तन का संकेत है, तो उसका महत्व केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सभ्यतागत भी है। आगे का प्रश्न यही है कि क्या यह परिवर्तन केवल शासन तक सीमित रहेगा या समाज की चेतना में भी स्थायी रूप से रूपांतरित होगा।

2026 का जनादेश : शासन परिवर्तन या जनचेतना?

इतिहास में कुछ चुनाव केवल सरकारें बदलते हैं, जबकि कुछ चुनाव समाज की दिशा बदलने वाले मोड़ सिद्ध होते है। पश्चिम बंगाल का 2026 का जनादेश इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। व्यापक जनभागीदारी और स्पष्ट जनादेश ने यह संकेत दिया कि मतदाताओं ने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली, विकास की प्राथमिकताओं और सार्वजनिक जीवन की संस्कृति में परिवर्तन की अपेक्षा व्यक्त की। लोकतंत्र की शक्ति केवल मतदान प्रतिशत में नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास में निहित होती है। जब समाज यह अनुभव करता है कि उसका मत भविष्य की दिशा निर्धारित कर सकता है, तब चुनाव लोकतांत्रिक अनुष्ठान से आगे बढ़कर जनचेतना की अभिव्यक्ति बन जाते हैं।

पिछले कुछ बर्षों में पश्चिम बंगाल के विभिन्न वर्गों में विकास, पारदर्शिता, कानून के समान शासन, निवेश, रोजगार और सांस्कृतिक आत्मसम्मान जैसे विषय अधिक प्रमुख होकर उभरे। यह भावना भी मजबूत हुई कि आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक पहचान एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हो सकते हैं। यदि किसी जनादेश को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त करना है, तो उसकी वास्तविक परीक्षा चुनाव परिणाम के बाद प्रारम्भ होती है। जनता केवल अधिकार नहीं देती; वह उत्तरदायित्व भी सौंपती है। शासन की पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा विकास की गति ही यह निर्धारित करती है कि जनादेश इतिहास बनेगा

या केवल राजनीतिक घटना बनकर रह जाएगा।

आज पश्चिम बंगाल के सामने यही चुनौती और अवसर दोनों उपस्थित हैं। यदि शासन और समाज परस्पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो यह परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बन सकता है।

भारतीय दृष्टि में 'निमित्त' और नेतृत्व

भारतीय दर्शन नेतृत्व को केवल अधिकार प्राप्त करने का माध्यम नहीं मानता। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं—''निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।'' अर्थात् मनुष्य अनेक बार इतिहास का निर्माता नहीं, बल्कि एक व्यापक उद्देश्य का माध्यम बनता है। इस विचार का अर्थ पुरुषार्थ का निषेध नहीं है। इसके विपरीत, पुरुषार्थ ही व्यक्ति को उस योग्य बनाता है कि वह किसी बड़े लक्ष्य का निमित्त बन सके। जब नेतृत्व व्यक्तिगत यश से ऊपर उठकर लोककल्याण को अपना ध्येय बनाता है, तभी उसका प्रभाव स्थायी होता है।

भारतीय इतिहास में आदि शंकराचार्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानन्द और अनेक युगपुरुष इसी आदर्श के उदाहरण हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अधिक अपने उद्देश्य को महत्व दिया। यही कारण है कि उनका प्रभाव उनके जीवनकाल से बहुत आगे तक बना रहा। लोकतंत्र में भी यही सिद्धान्त लागू होता है। कोई भी परिवर्तन केवल नेताओं के कारण नहीं आता। उसके पीछे समाज का विश्वास, कार्यकर्ताओं का समर्पण, संस्थाओं की शक्ति और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। इतिहास प्रायः उन्हीं अदृश्य प्रयासों का दृश्य परिणाम होता है।

इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की भूमिकाओं का उल्लेख किया जा सकता है। एक और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की विरासत को राष्ट्रीय स्मृति में अधिक प्रमुख स्थान देने के अनेक प्रयास हुए, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में वर्षों तक संगठनात्मक विस्तार और जनसंपर्क का सतत कार्य चलता रहा। इन प्रयासों का राजनीतिक मूल्यांकन अलग-अलग हो सकता है, किन्तु यह स्पष्ट है कि दीर्घकालिक परिवर्तन केवल चुनावी अभियानों से नहीं बल्कि निरंतर संगठन, संवाद और जनविश्वास से निर्मित होते हैं।

भारतीय दृष्टि फिर भी यही कहती है कि किसी ऐतिहासिक परिवर्तन का सम्पूर्ण श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। जब समाज तैयार होता है, नेतृत्व दिशा देता है और समय अनुकूल होता है, तभी इतिहास नई करवट लेता है।

नेताजी : त्याग, तपस्या और राष्ट्रधर्म

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भारतीय इतिहास के उन विरल व्यक्तित्वों में हैं जिनके जीवन का प्रत्येक चरण राष्ट्रसेवा के प्रति अद्वितीय समर्पण का प्रतीक है। स्वतंत्रता उनके लिए केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं थी; वह भारत की आत्मा और स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का अभियान था। नेताजी के अंतिम वर्षों को लेकर अनेक मत और शोध उपलब्ध हैं। विशेष रूप से 'गुमनामी बाबा' से जुड़े दावे आज भी इतिहासकारों के बीच विमर्श का विषय हैं। इन प्रश्नों का अंतिम उत्तर भविष्य के शोध और प्रमाणों पर निर्भर करेगा। इसलिए इन विषयों पर संतुलित दृष्टि रखना आवश्यक है।

किन्तु एक तथ्य निर्विवाद है कि नेताजी के व्यक्तित्व पर श्रीरामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानन्द की आध्यात्मिक परम्परा का गहरा प्रभाव था। उनके पत्रों और विचारों से स्पष्ट होता है कि आत्मानुशासन, साधना और चरित्र उनके राष्ट्रवाद के अभिन्न अंग थे। उनके लिए धर्म किसी संकीर्ण पहचान का विषय नहीं, बल्कि सत्य, कर्तव्य और आत्मविजय का मार्ग था। यदि गुमनामी बाबा से सम्बद्ध उपलब्ध आध्यात्मिक लेखन वास्तव में नेताजी का माना जाए, तो उनके व्यक्तित्व का एक अत्यंत गहरा आयाम सामने आता है—ऐसा आयाम जिसमें त्याग, मौन और तपस्या सार्वजनिक जीवन से भी आर्थिक महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। चाहे इन दावों पर अंतिम निष्कर्ष भविष्य में निकले, परन्तु त्याग और आत्मसंयम का आदर्श भारतीय राष्ट्रचिन्तन की स्थायी धरोहर है।

नेताजी का सबसे बड़ा संदेश संभवतः यही है कि नेतृत्व का आधार अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है; राष्ट्रनिर्माण का आधार केवल संगठन नहीं, चरित्र है; और किसी भी समाज का पुनर्जागरण अंततः उसके नागरिकों के आत्मानुशासन से ही संभव होता है।

बंगाल का पुनर्जागरण : जनादेश से जनजागरण तक

इतिहास में किसी भी जनादेश का महत्व केवल सत्ता परिवर्तन से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि वह समाज के आत्मविश्वास और सार्वजनिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित करता है। पश्चिम बंगाल का 2026 का जनादेश इसी कसौटी पर महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यह उस जनभावना की अभिव्यक्ति माना जा सकता है जो सुशासन, विकास, सुरक्षा, पारदर्शिता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। परिवर्तन की वास्तविक परीक्षा चुनाव के बाद प्रारम्भ होती है। यदि शासन उत्तरदायित्व, प्रशासनिक दक्षता और जनविश्वास को सुदृढ़ करने में सफल होता है, तो लोकतांत्रिक जनादेश सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकता है। इसी प्रकार यदि नागरिक भी अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन करें, तो लोकतंत्र केवल शासन-व्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण का सशक्त माध्यम बन जाता है।

इस परिवर्तन के पीछे वर्षों का संगठनात्मक प्रयास, समाज के विभिन्न वर्गों के साथ सतत संवाद और परिवर्तन की जनाकांक्षा भी महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक परिवर्तन की सफलता का श्रेय केवल नेतृत्व को नहीं, बल्कि उन असंख्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों को भी जाता है, जो दीर्घकाल तक मौन रहकर समाज में विश्वास का निर्माण करते हैं। बंगाल के सामने आज अनेक अवसर हैं—औद्योगिक पुनरुत्थान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार सृजन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सीमावर्ती सुरक्षा, सामाजिक समरसता और निवेश-अनुकूल वातावरण का निर्माण। यदि इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक दृष्टि और नीति-निरंतरता बनी रहती है, तो बंगाल पुनः राष्ट्रीय विकास का अग्रणी केन्द्र बन सकता है।

पुनर्जागरण की वास्तविक कसौटी

किसी भी पुनर्जागरण की सफलता चुनावी विजय से नहीं, बल्कि समाज में दिखाई देने वाले स्थायी परिवर्तनों से मापी जाती है। वास्तविक परिवर्तन तब होगा—

- ✦ जब राजनीति पुनः लोकसेवा का माध्यम बने।
- ✦ जब प्रशासन निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का प्रतीक बने।
- ✦ जब शिक्षा केवल रोजगार नहीं, बल्कि चरित्र और नागरिकता का निर्माण करे।
- ✦ जब उद्योग और उद्यमिता युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर प्रदान करें।
- ✦ जब सांस्कृतिक विरासत आधुनिक विकास के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़े।
- ✦ और जब धर्म आत्मोन्नति, करुणा और लोकमंगल का मार्ग बने।

इसी संतुलन में भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति निहित है। विकास और संस्कृति, आधुनिकता और परम्परा, आर्थिक प्रगति और नैतिक उत्तरदायित्व—इनके बीच संतुलन स्थापित करना ही किसी भी समाज के स्थायी पुनर्जागरण का आधार है।

इतिहास का निर्णय तत्काल नहीं होता। किसी भी परिवर्तन का वास्तविक मूल्यांकन समय करता है। इसलिए पश्चिम बंगाल के 2026 के जनादेश को भी अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक संभावित ऐतिहासिक मोड़ के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि राष्ट्रनिर्माण केवल राजनीतिक संघर्ष से नहीं होता; उसके लिए अनुशासन, त्याग, चरित्र, संगठन और आत्मबल की आवश्यकता होती है। यही भारतीय राष्ट्रचिन्तन की स्थायी परम्परा भी है। यदि पश्चिम बंगाल आने वाले वर्षों में सुशासन, शिक्षा, उद्योग, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सामाजिक समरसता को समान महत्व देते हुए आगे बढ़ता है, तो वह पुनः भारत के बौद्धिक और राष्ट्रीय जीवन में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है। तब यह परिवर्तन केवल एक राज्य की उपलब्धि नहीं रहेगा; वह भारतीय लोकतंत्र की उस क्षमता का उदाहरण होगा जिसमें समाज समय-समय पर स्वयं अपनी दिशा निर्धारित करता है।

इतिहास के कुछ क्षण केवल शासन नहीं बदलते, वे समाज के आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करते हैं। यदि 2026 का जनादेश उस व्यापक यात्रा का प्रारम्भ सिद्ध होता है, तो भविष्य इसे केवल राजनीतिक विजय के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रचेतना के पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्मरण कर सकता है।

वन्दे मातरम्। जय हिन्द। ■

श्रीमद्भागवत पुराण के श्रोता कैसे हों?

अरुण चूड़ीवाल

वर्तमान में श्रीमद्भागवत पुराण कथा सप्ताह के निरंतर आयोजन हो रहे हैं। द्वादश स्कंध की कथा समाप्त होने के पश्चात श्रीमद्भआगवत पुराण में श्रीमद्भागवतमहात्म्यम् में है।

महात्म्य के 4 अध्याय हैं। इनमें कुल 199 श्लोक हैं।

महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के 10-28 श्लोकों में भागवत के श्रोताओं का वर्गीकरण किया गया है।

भागवत आयोजक स्वयं किस प्रकार के श्रोताओं को आमंत्रित करें, इस दृष्टि से महात्म्य में उल्लेखित वर्गीकरण निम्नलिखित हैं **:**

सूतजी कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्ण की कथा का श्रोता दो प्रकार के माने गये हैं—प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम)।

प्रवर श्रोताओं के 'चातक', 'हंस', 'शुक्र' और 'मीन' आदि कई भेद हैं। अवर के भी 'वृक', 'भूरुण्ड', 'वृष' और 'उष्ट्र' आदि अनेकों भेद बतलाये गये हैं।

'चातक' जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं—उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्ण सम्बन्धी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह 'चातक' कहा गया है।

हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सारभाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस' कहते हैं।

तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आनेवाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुँह से उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओं को अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 'शुक' कहलाता है।

क्षीरसागर में मछली मौन रहकर अपलक आँखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुँह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'मीन' कहा गया है।

अब अवर यानी अधम श्रोता बताये जाते हैं।

'वृक' कहते हैं भेड़िये को जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डरानेवाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीज-बीज में जोर-जोर से बोल उछठता है, वह 'वृक' कहलाता है।

हिमालय के शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी होता है। वह वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किन्तु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाये पर स्वयं आचरण में न लाये, ऐसे श्रोता को 'भूरुण्ड' कहते हैं।

'वृष' कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी—असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता है।

ऊँट माधुर्यगुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान् की मधुर कता को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे 'ऊँट' कहते हैं।

इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के 'भ्रमर' और 'गधा' आदि बहुत-से भेद हैं, इन सब भेदों को उन-उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार-व्यवहारों से परखना चाहिये।

श्रीमद्भागवत का सेवन चार प्रकार का है—सात्त्विक, राजस, तामस और निर्गुण।

जिसमें यज्ञ की भाँति तैयारी की गयी हो, बहुत-सी पूजा-सामग्रियों के कारण जो अत्यन्त शोभासम्पन्न दिखायी दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ सात दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाय, वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद्भआगवतका सेवन 'राजस' है।

एक या दो महीने में धीरे-धीरे कथा के रसका आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनन्द को बढ़ानेवाला 'सात्विक' सेवन कहलाता है।

तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाय और याद आनेपर फिर आरम्भ कर दिया जाय, इस प्रकार एक वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाय। यह 'तामस' सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देनेवाला है।

जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाय, तब वह सेवन 'निर्गुण' माना गया है। ■

"সত্যকে হাজার বার বললেও তা মিথ্যা হয় না। আর মিথ্যাকে হাজার বার বললেও তা সত্য হয় না।"

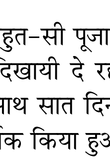

—স্বামী বিবেকানন্দ

দুর্গাবাহিনী মাতৃশক্তি পরিচিতি বর্গ, ভগবানপুর, দক্ষিণবঙ্গ

দুর্গাবাহিনী পরিচিতি বর্গ, মেদিনীপুর, দক্ষিণবঙ্গ

হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস পালন, বিশ্ব হিন্দু বার্তা কার্যালয়, কলকাতা

বিষ্ণুপুর এসডিও সাহেবের হাতে বিশ্ব হিন্দু বার্তা প্রদান

পাঠক সম্পর্ক অভিযান, রানিগঞ্জ, আসানসোল জেলা, মধ্যবঙ্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিচিতি বর্গ, দক্ষিণ নদীয়া জেলা, মধ্যবঙ্গ

বিশ্ব হিন্দু বার্তার কার্যকর্তাদের উদ্যোগে কলকাতায় জলছত্র

সৌজন্যে :

‘চর অচর অর্পণ ন্যাস’ (Char Achar Arpan Nyas)

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga
33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing, B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1964@gmail.com, vishvahinduvarta@yahoo.in